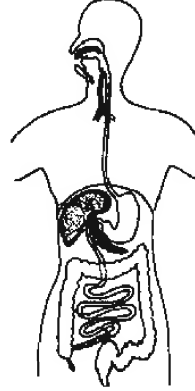
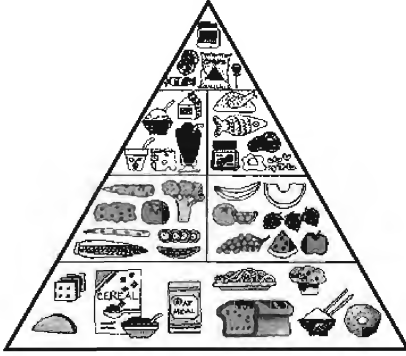


পঞ্চম অধ্যায়

খাদ্য, পুষ্টি এবং পরিপাক

জীব মাত্রই খাদ্যগ্রহণ করে অর্থাৎ জীবের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য প্রয়োজন। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া ভিন্ন। উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয়। মানবদেহের জন্য খাদ্য, পুষ্টি ও পরিপাক প্রক্রিয়া এবং উদ্ভিদের পুষ্টি এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- উদ্ভিদের পুষ্টির অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বর্ণনা করতে পারব।
- উদ্ভিদে পুষ্টির অভাবজনিত লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রাণীর খাদ্যের প্রধান উপাদান ও উৎস বর্ণনা করতে পারব।
- আদর্শ খাদ্য পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য গ্রহণের নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুষ্টির অভাবজনিত রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারব।
- কিলো ক্যালরি ও কিলো জুল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পুষ্টি উপাদানে শক্তির পরিমাণ এবং ক্যালরি ও জুলে এদের রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) ও বডি মাস রেশিউ (বিএমআর) এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিএমআই ও বিএমআর এর হিসাব করতে পারব।
- বিএমআর এবং ব্যয়িত শক্তির সাথে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব।
- বয়স ও লিঙ্গভেদে বিএমআই হিসাব করতে পারব।
- সুস্থ জীবনযাপনে শরীরচর্চা ও বিশ্রামের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যে অতিমাত্রায় রাসায়নিক পদার্থ এবং রঞ্জকের ব্যবহারের শারীরিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রধান অংশ ও সহায়তাকারী অঙ্গের গঠন ও কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- যকৃতের (Liver) কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- অগ্ন্যাশয়ের কাজ বর্ণনা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাকে উৎসেচকের (Enzyme) ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব।
- অন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা জনিত রোগ এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে পারব।
- সাত দিনের গৃহীত খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করে এটিকে সুবন্ধ খাদ্যের সাথে তুলনা করতে পারব।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- পৌষ্টিকতন্ত্রের প্রধান অংশের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করতে পারব।
- পরিপাকতন্ত্রের রোগের বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং পরিবারের সদস্যদের সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করব।
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে নিজে সচেতন হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

উদ্ভিদের খনিজ পুষ্টি

উদ্ভিদ খনিজ পুষ্টি (Plant mineral nutrition) : উদ্ভিদ মাটি ও পরিবেশ থেকে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শারীরবৃত্তীয় কাজ এবং প্রজননের জন্য যেসব পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে তাই উদ্ভিদ পুষ্টি। এসকল পুষ্টি উপাদানের অধিকাংশই উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগ্রহ করে বলে এদেরকে খনিজ পুষ্টি বলা হয়। উদ্ভিদে প্রায় ৬০টি অজৈব উপাদান শনাক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এ ৬০টি উপাদানের মধ্যে মাত্র ১৬টি উপাদান উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এ ১৬টি পুষ্টি উপাদানকে সমষ্টিগতভাবে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান (essential elements) বলা হয়। কারণ এই উপাদানগুলো সব ধরনের উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, শারীরবৃত্তীয় কাজ ও প্রজননের জন্য প্রয়োজন। এদের যে কোনো একটির অভাব হলে উদ্ভিদে এর অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms) প্রকাশ পায় এবং পুষ্টি অভাবজনিত রোগের সৃষ্টি হয়। একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের কাজ অপরটি দিয়ে সম্পন্ন হয় না।

অত্যাবশ্যকীয় ১৬টি উপাদানের মধ্যে উদ্ভিদ কোনো কোনো উপাদান বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে, আবার কোনো কোনো উপাদান সামান্য পরিমাণে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ কর্তৃক গ্রহীত অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এদেরকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা : ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রোউপাদান (macro-nutrient বা macro-element) এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রোউপাদান (micro-nutrient বা micro-element)।

(ক) **ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রোউপাদান :** উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান বেশি পরিমাণে দরকার হয় সেগুলোকে ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রোউপাদান বলা হয়। ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা ম্যাক্রোউপাদান ০৯টি, যথা : নাইট্রোজেন (N), পটাসিয়াম (K), ফসফরাস (P), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O) এবং সালফার (S)।

(খ) **মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রোউপাদান :** উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য যেসব উপাদান অত্যন্ত সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাদেরকে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টর বলা হয়। মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ০৭টি, যথা— দস্তা বা জিংক (Zn), ম্যাংগানিজ (Mn), লৌহ বা আয়রন (Fe), মোলিবডেনাম (Mo), বোরন (B), তামা বা কপার (Cu) এবং ক্লোরিন (Cl)।

পুষ্টি উপাদানের উৎস : উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন ও অক্সিজেন বায়ুমন্ডল থেকে গ্রহণ করে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পানি থেকে গ্রহণ করে। অন্যসব উপাদান মাটি থেকে মূলের সাহায্যে শোষণ করে। এ উপাদানগুলো মাটিতে বিভিন্ন লবণ হিসেবে থাকে। কিন্তু উদ্ভিদ এগুলোকে লবণ হিসেবে সরাসরি শোষণ করতে পারে না। এরা বিভিন্ন আয়ন হিসেবে শোষিত হয়। যেমন : Ca^{++} , Mg^{++} , NH_4^+ , NO_3^- , K^+ ইত্যাদি।

উদ্ভিদের পুষ্টিতে বিভিন্ন খনিজ উপাদানের ভূমিকা : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খনিজ পুষ্টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হয়। আর ক্লোরোফিল সৃষ্টি ব্যাহত হলে খাদ্য প্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হয়। খাদ্যপ্রস্তুত বাধাপ্রাপ্ত হলে শ্বসন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে এবং শক্তি নির্গমন হ্রাস পায়। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণুর একটি উপাদান। কাজেই এর অভাব হলে ক্লোরোফিল অণু সৃষ্টি এবং সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত ব্যাহত হবে। উদ্ভিদের বহু জৈবিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় পটাসিয়াম সহায়ক হিসেবে কাজ করে। পত্ররঙ্গ খোলা ও বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পটাসিয়ামের গুরুত্ব অপরিণীম। কোষবিভাজনের মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে পটাসিয়াম। ইহা মূল, ফুল ও ফল উৎপাদন ও বর্ধনেও সাহায্য করে। মূল বর্ধনের জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ফসফরাস জীবকোষের DNA, RNA, ATP প্রভৃতির গাঠনিক উপাদান। কাজেই এটি ছাড়া উদ্ভিদের পুষ্টি একেবারেই

সম্ভব নয়। পুষ্টিতে এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্যই আমরা ভালো ফলন পেতে জমিতে নাইট্রোজেন (ইউরিয়া), পটাসিয়াম (মিউরেট অফ পটাস), ফসফরাস (ট্রিপল সুপার ফসফেট) প্রভৃতি সার ব্যবহার করে থাকি।

পুষ্টি উপাদানের গুরুত্ব : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বিভিন্ন খনিজ পুষ্টি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নাইট্রোজেন নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন ও ক্লোরোফিলের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। উদ্ভিদের সাধারণ দৈহিক বৃদ্ধিতে নাইট্রোজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কোষ কলায় পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ফসফরাস নিউক্লিক এসিড, বিভিন্ন ফসফোলিপিড, NADP, ATP প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্যের সাংগঠনিক উপাদান। উদ্ভিদের মূল বর্ধনের জন্য ফসফরাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। পটাসিয়াম উদ্ভিদে পানি পরিশোধে সাহায্য করে। পত্ররক্ষা খোলা ও বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে পটাসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। ইহা মূল, ফুল ও ফল উৎপাদন ও বর্ধনেও সাহায্য করে থাকে। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরোফিল অণুর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং শ্বসন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।

আয়রন সাইটোক্রোমের সাংগঠনিক উপাদান, কাজেই বায়বীয় শ্বসন এর উপর নির্ভরশীল। ক্লোরোফিল সৃষ্টিতেও আয়রনের ভূমিকা অপরিসীম। ক্লোরোপ্লাস্ট গঠন ও সংরক্ষণের জন্য ম্যাংগানিজ প্রয়োজন। টমেটো, সূর্যমুখী উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য তামা প্রয়োজন, শ্বসন প্রক্রিয়ার উপর তামার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদের সক্রিয়ভাবে বর্ধনশীল অঞ্চলের জন্য বোরন প্রয়োজন, চিনি পরিবহনে বোরন পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। অ্যামাইনো এসিড সংশ্লেষণের জন্য দস্তা প্রয়োজন। উদ্ভিদের স্বাভাবিক বিপাকীয় কার্যে এর কিছু প্রয়োজন হয়। অণুজীব দ্বারা বায়বীয় নাইট্রোজেন সংরক্ষণের জন্য মোলিবডেনাম আবশ্যিক। সুগারবিট এর মূল ও কাণ্ডের বৃদ্ধির জন্য ক্লোরিন প্রয়োজন।

পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ : উদ্ভিদের কোনো পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বিশেষ লক্ষণের মাধ্যমে উদ্ভিদ তা প্রকাশ করে। এ লক্ষণগুলোকে বলা হয় অভাবজনিত লক্ষণ (deficiency symptoms)। এ লক্ষণ দেখে আমরা বুঝতে পারি কোন উদ্ভিদ বা ফসলে কোন পুষ্টি উপাদানের অভাব রয়েছে। নিচে কিছু উপাদানের অভাবজনিত লক্ষণ উল্লেখ করা হলো :

উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ
নাইট্রোজেন (N)	নাইট্রোজেনের অভাব হলে ক্লোরোফিল সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটে। ফলে পাতাগুলো হলুদ হয়ে যায়। পাতা হলুদ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলে 'ক্লোরোসিস' (chlorosis)। কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজন হ্রাস পায়, তাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়।
ফসফরাস (P)	ফসফরাসের অভাব হলে পাতা বেগুনি রং ধারণ করে। পাতায় মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয়। পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় ও উদ্ভিদ খর্বাকার হয়।
পটাসিয়াম (K)	পটাসিয়ামের অভাবে পাতার শীর্ষ ও কিনারা হলুদ হয় এবং মৃত অঞ্চল সৃষ্টি হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি কম হয় এবং শীর্ষ ও পার্শ্ব মুকুল মরে যায়।
ক্যালসিয়াম (Ca)	ক্যালসিয়ামের অভাবে কঁচি পাতায় ক্লোরোসিস হয়, উদ্ভিদের বর্ধনশীল শীর্ষ অঞ্চল মরে যায়। ফুল ফোটার সময় উদ্ভিদের কাণ্ড শুকিয়ে যায় এবং উদ্ভিদ হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে।
ম্যাগনেসিয়াম (Mg)	ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে ক্লোরোফিল সংশ্লেষিত হয় না বলে সবুজ রং হালকা হয়ে যায় এবং সাইটোক্রোমের হার কমে যায়। পাতার সরু শিরাসমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অধিক হারে ক্লোরোসিস হয়।

উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ
লৌহ (Fe)	লৌহের অভাবে প্রথমে কচি পাতার রং হালকা হয়ে যায়, তবে পাতার সবু শিরার মধ্যবর্তী স্থানেই প্রথম হালকা হয় এবং ক্লোরোসিস হয়। কখনও কখনও সম্পূর্ণ পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। কাণ্ড দুর্বল ও ছোট হয়।
সালফার (S)	সালফারের অভাবে পাতা হালকা সবুজ হয় এবং পাতায় লাল ও বেগুনি দাগ দেখা যায়। কচি পাতায় বেশি এবং বয়োবৃদ্ধ পাতায় কম ক্লোরোসিস হয়। কাণ্ডের শীর্ষ মরে যায় এবং ডাইব্যাক (dieback) রোগের সৃষ্টি হয়। কাণ্ডের মধ্যপর্ব ছোট হয়, ফলে উদ্ভিদ খর্বাকৃতির হয়।
বোরন (B)	বোরনের অভাবে উদ্ভিদের বর্ধনশীল অগ্রভাগ মরে যায়। কচি পাতার বৃদ্ধি কমে যায় এবং পাতা বিকৃত হয়, কাণ্ড খসখসে হয়ে ফেটে যায়। ফুলের কুঁড়ির জন্ম ব্যাহত হয়।

কাঙ্ক্ষ : শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের কোন কোন খনিজ মৌলের অভাবে গাছে কী কী অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয় তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

প্রাণীর খাদ্য ও পুষ্টি : তোমরা ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণিতে জেনেছ, জীবন ধারণের জন্য খাদ্য যেমন অপরিহার্য, তেমনি সু-স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিও সুমম খাদ্য প্রয়োজন। এই খাদ্যই জীবকোষে দগ্ধীভূত হয়ে দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। দহন বলতে জীবদেহের ভিতরে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে বুঝায়। জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাসায়নিক প্রভাবের গুরুত্ব অপরিসীম। চলাফেরা, খেলাধুলা ইত্যাদি যাবতীয় কাজে শক্তির প্রয়োজন। আমরা এই শক্তি পাই খাদ্য থেকে। যেসব বস্তু খাওয়ার পর দেহে শোষিত হয়ে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে তাকে খাদ্য বলে। যেমন, দেহের পুষ্টি সাধন, দেহের ক্ষয়পূরণ, দেহে রোগ প্রতিরোধক শক্তি উৎপাদন এবং কর্মশক্তি ও তাপ উৎপাদন।

খাদ্যের প্রধান উপাদান ও উৎস : সম্মিলিতভাবে উল্লেখিত কার্যসমূহ আমাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন। এ কাজগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান প্রয়োজন। খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এই রাসায়নিক বস্তুগুলোকে খাদ্য উপাদান বলে। এই উপাদানগুলোর মধ্যে পুষ্টি নিহিত, তাই খাদ্য উপাদানকে পুষ্টি উপাদানও বলা হয়। অধিকাংশ খাদ্যে একাধিক খাদ্য উপাদান থাকে। কোনো খাদ্যে যে উপাদানটি বেশি পরিমাণে থাকে তাকে সেই উপাদানের খাদ্য হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। উপাদান অনুযায়ী খাদ্যবস্তুকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

১. **আমিষ :** দেহের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরণ করে।
২. **শর্করা :** দেহে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করে।
৩. **স্নেহ ও চর্বিজাতীয় খাদ্য :** দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে।

এছাড়া আরও তিন প্রকার উপাদানও দেহের জন্য প্রয়োজন। যেমন—

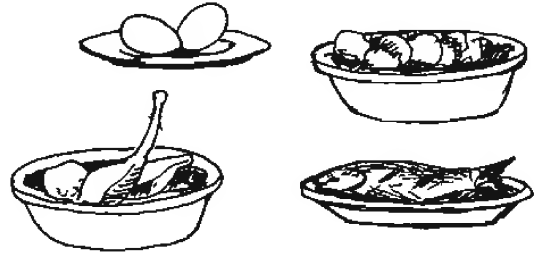
১. **খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন :** রোগ প্রতিরোধক শক্তি বাড়ায় ও বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্দীপনা যোগায়।
২. **খনিজ লবণ :** বিভিন্ন জৈবিক কাজে অংশ নেয়।
৩. **পানি :** দেহে পানি ও তাপের সমতা রক্ষা করে, এছাড়া কোষের কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ, কোষ অঙ্গাণুসমূহকে ধারণ করে।

আমিষ বা প্রোটিন

আমিষ জাতীয় খাদ্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত। আমিষে শতকরা ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। সালফার, ফসফরাস এবং আয়রন আমিষে সামান্য পরিমাণে থাকে। নাইট্রোজেন এবং শেবোক্ত উপাদানগুলোর উপস্থিতির কারণে আমিষের গুরুত্ব শর্করা ও তৈল পদার্থ থেকে আলাদা। একমাত্র আমিষ উপাদানেই নাইট্রোজেন বর্তমান। শুধু আমিষ জাতীয় খাদ্যই দেহে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে বলে পুষ্টিবিজ্ঞানে আমিষ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

আমিষ খাদ্যের উৎস :

আমরা আগেই জেনেছি মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, শিমের বীচি, স্টিকি মাছ, চিনাবাদাম ইত্যাদি থেকে আমরা আমিষ পাই।



উৎস অনুযায়ী আমিষ দুই প্রকার :

১. প্রাণিজ আমিষ ও
২. উদ্ভিজ্জ আমিষ

চিত্র ৫.১: আমিষ জাতীয় খাদ্য

প্রাণিজ আমিষ : মাছ, মাংস, ডিম, পনির, ছানা, কলিজা বা যকৃত ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। এসব খাদ্যে দেহের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায় বলে এগুলো উচ্চমানের আমিষ। এসব খাদ্যের জৈবমূল্য বেশি। আমাদের খাদ্য তালিকায় কমপক্ষে শতকরা ২০ ভাগ প্রাণিজ আমিষ থাকা দরকার।

উদ্ভিজ্জ আমিষ : ডাল, চিনাবাদাম, চাল, আটা, শিমের বীচি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষ। এগুলো প্রাণিজ আমিষের তুলনায় কম পুষ্টিকর, কারণ উদ্ভিজ্জ আমিষে প্রয়োজনীয় সব কয়টা অ্যামাইনো এসিড থাকে না। বীজে আমিষের পরিমাণ উদ্ভিদের অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি থাকে। উদ্ভিজ্জ আমিষের জৈবমূল্য কম বিধায় তা নিশ্চয়নের আমিষ।

গবেষণায় দেখা গেছে, দুই বা ততোধিক উদ্ভিজ্জ আমিষ একত্রে রান্না করে খাদ্যমান বাড়ানোর ফলে আট রকম আবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়। বিভিন্ন আমিষের সর্বমিশ্রণে তৈরি এরূপ উপাদান মিশ্র আমিষ নামে পরিচিত। মিশ্র আমিষকে সম্পূরক আমিষও বলা হয়। কীভাবে বিভিন্ন খাদ্যের সর্বমিশ্রণে সম্পূরক আমিষ তৈরি করা যায় তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. চালের সাথে দুধ দিয়ে পায়ের, ক্ষীর ও কিরনি রান্না করা যায়।
২. ডাল ও চাল দিয়ে খিচুড়ি রান্না করা যায়।
৩. ডাল, গম, মাংস মিশিয়ে হালিম রান্না করা যায়।
৪. ভাতের সাথে মাছ ও ডাল পরিবেশন করা যায়।
৫. দুধ দুটি খাওয়া যায়।
৬. দুটি ডাল খাওয়া এবং
৭. নানরকম ডাল সমপরিমাণ মিশিয়ে রান্না করে সম্পূরক আমিষ তৈরি করা যায়।

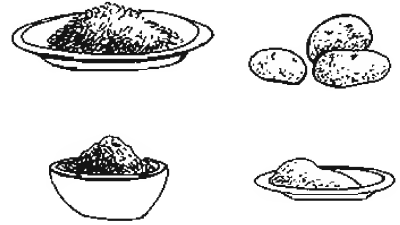
শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrate)

শর্করা জাতীয় খাদ্য দেহের কাজ করার শক্তি জোগায়। শর্করার মৌলিক উপাদান কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল ও বীজে শর্করা বিভিন্নরূপে জমা থাকে। ফলের রসে গ্লুকোজ, দুধে ল্যাকটোজ, গম, আলু, চাল ইত্যাদিতে স্টার্চ বা শ্বেতসার ইত্যাদি শর্করা খাদ্যের বিভিন্ন রূপ। গঠন পদ্ধতি অনুসারে শর্করাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। নিচের সারণিতে এই তিন ধরনের শর্করার গঠন ও উৎস দেখানো হলো।

সারণি ১০.২ : শর্করার শ্রেণিবিভাগ

শর্করা শ্রেণি	গঠন	উদাহরণ	উৎস
এক শর্করা	এক অণুবিশিষ্ট শর্করা	গ্লুকোজ	মধু, ফলের রস
দ্বি-শর্করা	দুই অণুবিশিষ্ট শর্করা	সুক্রোজ, ল্যাকটোজ	চিনি ও দুধ
বহু শর্করা	বহু অণুবিশিষ্ট শর্করা	শ্বেতসার গ্লাইকোজেন	চাল, আটা, সবুজ পাতা, আলু, শাক-সবজি

প্রধানত : চাল, গম, আলু থেকে আমরা শ্বেতসার পাই। কাঁচা খাদ্যের শ্বেতসার সহজে হজম হয় না। এজন্য আমরা চাল, আটা, আলু ইত্যাদি রান্না করে খাই। খাওয়ার পর শর্করা পরিপাক হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়। দ্বি-শর্করা ও বহু শর্করা পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিণত হয়ে দেহে শোষণযোগ্য হয়। মানব পরিপুষ্টির জন্য সরল শর্করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানবদেহ শুধু সরল শর্করা শোষণ করতে পারে।

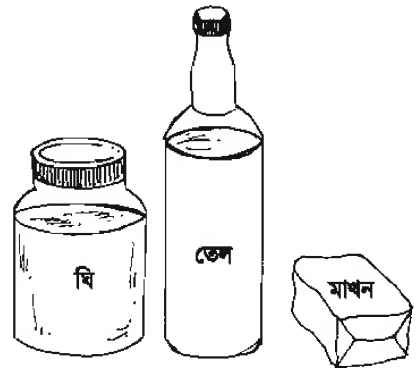


চিত্র ৫.২: শর্করা জাতীয় খাদ্য

স্নেহ জাতীয় খাদ্য (Fats)

চর্বি একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান। কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন দ্বারা গঠিত উপাদানটির মুখ্য কাজ হলো তাপ উৎপাদন করা। এই উপাদানটি পাকস্থলিতে অনেকক্ষণ থাকে, তাই ক্ষুধা পায় না। দেহের ত্বকের নিচে চর্বি জমা থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন অঙ্গ যেমন— যকৃত, মস্তিষ্ক, মাংস পেশিতেও চর্বি জমা থাকে। দেহের এ সঞ্চিত চর্বি উপবাসের সময় কাজে লাগে। শর্করা ও আমিষের তুলনায় চর্বিতে প্রায় দ্বিগুণ ক্যালরি থাকে। ক্যালরি হলো প্রাণীদেহে শক্তি মাপার একটি একক। খাবার তেল বা ঘি দিয়ে রান্না করা খাবার বেশ সুস্বাদু হয়, সঙ্গে এর পুষ্টিমানও বেড়ে যায়। যেমন— সেশ্য আলুর চেয়ে ভাজা আলু, রুটির চেয়ে ভুটি বা পরোটা শুধু মুখরোচকই নয়, এতে ক্যালরিও বেশি পাওয়া যায়। কোনো কোনো চর্বিতে ভিটামিন ‘এ’ আছে, আবার কোনোটিতে আছে ভিটামিন ‘ই’।

উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ দুই ধরনের : ১. উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ এবং ২. প্রাণীজ স্নেহ পদার্থ।



চিত্র ৫.৩: স্নেহ জাতীয় খাদ্য

১. **উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ** : সয়াবিন, সরিষা, তিল, বাদাম, সূর্যমুখী এবং ভুট্টার তেল ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভোজ্যতেলের মধ্যে সয়াবিন তেল উৎকৃষ্টতম।
২. **প্রাণিজ্জ স্নেহ পদার্থ** : চর্বি, ঘি, ডালডা ইত্যাদি প্রাণিজ্জ স্নেহ পদার্থ। ডিমের কুসুমে স্নেহ পদার্থ আছে, কিন্তু সাদা অংশে স্নেহ পদার্থ থাকে না। স্নেহ পদার্থ পানিতে অদ্রবণীয়। পানির চেয়ে হালকা বলে পানির উপর ভাসে। একজন সুস্থ সবল পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দিনে ৫০-৬০ গ্রাম চর্বির প্রয়োজন হয়।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন (Vitamins)

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ভিটামিনের পরিমাণ খুব সামান্য হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেহের বৃদ্ধির জন্য ও সুস্থ থাকার জন্য ভিটামিন অত্যাবশ্যক। সুখম খাদ্যে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য উপাদান থাকে বলে সুখম খাদ্য থেকে প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়। তবে নিয়মিত ভিটামিনবিহীন খাবার খেলে কিছুদিনের মধ্যে দেহে ভিটামিনের অভাবজনিত সমস্যা দেখা দেয়। পরবর্তী কালে তা মারাত্মক আকারে স্থায়ীভাবে দেহের ক্ষতি সাধন করে, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

ভিটামিনকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- ১. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং ২. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। ভিটামিন ‘এ’, ‘ডি’, ‘ই’ এবং ‘কে’ চর্বিতে এবং ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন ‘সি’ পানিতে দ্রবণীয়।

দুধ, মাখন, চর্বি, ডিম, গাজর, আম, কাঁঠাল, রঙিন শাকসবজি, মলা মাছ ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। ইন্সট, টেকিহাঁটা চাল, খাঁতায় ভাজা আটা বা লাল আটা, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগডাল, মটর, ফুলকপি, চিনাবাদাম, শিমের বীচি, কলিজা বা যকৃত, হুণ্ডপিত, দুধ, ডিম, মাংস, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘বি’ থাকে। পেয়ারা, বাতাবী লেবু, কামরাঙা, কমলা, আমড়া, বাধাকপি, টমেটো, আনারস, কাঁচামরিচ, তাজা শাকসবজি ইত্যাদি থেকে ভিটামিন ‘সি’ পাওয়া যায়। দুধ, ডিম, কলিজা বা যকৃত, দুগ্ধজাত দ্রব্য, মাছের তেল, ভোজ্যতেল ইত্যাদিতে ভিটামিন ‘ডি’ থাকে। উপরে উল্লিখিত সব খাবার থেকে ভিটামিন ‘ই’ ও ‘কে’ পাওয়া যায়।

খনিজ লবণ (Mineral salts)

দেহ কোষ ও দেহের তরল অংশের দেহতরলের জন্য খনিজ লবণ অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মানবদেহে ক্যালসিয়াম, লৌহ, সালফার, দস্তা, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি খনিজ লবণ থাকে। এ উপাদানগুলো কখনও মৌলিক উপাদানরূপে মানবদেহে অবস্থান করে না। এগুলো খাদ্য ও মানবদেহে বিভিন্ন পরিমাণে অন্য পদার্থের সাথে মিলিত হয়ে নানা জৈব ও অজৈব যৌগের লবণ তৈরি করে। খনিজ লবণ দেহ গঠন ও দেহের অভ্যন্তরীণ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। হাড়, দাঁত, পেশি, এনজাইম ও হরমোন গঠনের জন্য খনিজ লবণ একটি অপরিহার্য উপাদান। স্নায়ুর উদ্দীপনা, পেশি সংকোচন, দেহকোষে পানির সাম্যতা বজায় রাখা, অম্ল ও ক্ষারের সমতাবিধান ইত্যাদি কাজে খনিজ লবণের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

দুধ, দই, ছানা, পনির, ছোট মাছ (মলা-ঢেলা), নানা রকম ডাল, সবুজ শাকসবজি, চুড়ুস, লাল শাক, কাঁচু শাক ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস। কলিজা, সবুজ শাকসবজি, মাংস, ডিমের কুসুম, কচু শাক ইত্যাদিতে লৌহ থাকে। দুধ, মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল থেকে ফসফরাস পাওয়া যায়। খাবার লবণ, চিপস, নোনতা খাবার, পনির, বাদাম, আচার ইত্যাদিতে সোডিয়াম থাকে। মাছ, মাংস, বাদাম, ডাল, কলা, আলু, গাজর, আপেল ইত্যাদিতে পটাসিয়াম থাকে। ক্লোরিনের উৎস হলো মাছ, মাংস ও খাবার লবণ। আয়োডিনের উৎস হলো সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও মাছ, মাংস এবং শেওলা।

পানি (Water)

পানির অপর নাম জীবন। জীবন রক্ষার কাজে অক্সিজেনের পরেই পানির স্থান। দেহের পুষ্টির কাজে পানি অপরিহার্য। দেহের গঠন ও অভ্যন্তরীণ কাজ পানি ছাড়া চলতে পারে না। মানবদেহে পানির কাজগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. দেহ গঠন, ২. দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ ও ৩. দেহ থেকে দূষিত পদার্থ নির্গমন।

১. দেহ গঠন : দেহকোষেও গঠন ও প্রতিপালন পানি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক ওজনের ৪৫%-৬০% পানি।
২. দেহের অভ্যন্তরীণ কার্য নিয়ন্ত্রণ : পানি ব্যতীত দেহাভ্যন্তরে কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া চলতে পারে না। দেহে পানি দ্রাবকরূপে কাজ করে। পানির জন্যই দেহে রক্ত সঞ্চালন সম্ভব। রক্তে পরিবাহিত খাদ্য উপাদান এবং অক্সিজেন পানির মাধ্যমে দেহকোষে পৌঁছতে পারে। দেহের সকল প্রকার রসে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় ক্ষুদ্রাত্ত্বের মধ্য দিয়ে রক্তে বিশোষিত হয়।
৩. দূষিত পদার্থ নির্গমন : পানি দেহের দূষিত পদার্থ অপসারণে সহায়তা করে। মলমূত্র, ঘাম ইত্যাদি দূষিত পদার্থের সাথে দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বের হয়ে যায়।

এইভাবে প্রতিদিন দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি নির্গত হয়। তাছাড়া বয়স, আবহাওয়া, পরিশ্রম, খাওয়ার অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলো পানির চাহিদা প্রভাবিত করে। তাই একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ১ লি. পানি পান করা প্রয়োজন। যেমন- কোনো ব্যক্তির দৈনিক ক্যালরি চাহিদা ২০০০ কিলোক্যালরি হলে, তার দৈনিক ২ লি. পানির প্রয়োজন হয়।

খাদ্য আঁশ (Fibre) বা রাফেজ

শস্য দানার বহিরাবরণ, সবজি, ফলের খোসা, শাঁস বীজ এবং উদ্ভিদের ডাটা, ফল, মূল, পাতায় আঁশ থাকে। এগুলো মূলত কোষ প্রাচীরের সেলুলোজ এবং লিগনিন। হাড় যেমন মানবদেহের কাঠামো তৈরি করে, সেলুলোজ ও রাফেজ তেমনি উদ্ভিদের কাঠামো তৈরি করে। এগুলো জটিল শর্করা। গবাদিপশু যেমন- গরু, ছাগল, মহিষ ইত্যাদি সেলুলোজ হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষ এগুলো হজম করতে পারে না। রাফেজ পানি শোষণ করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং বৃহদন্ত্র থেকে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে। রাফেজযুক্ত খাবার বিবাক্ত বর্জনীয় বস্তুকে খাদ্যনালি থেকে পরিশোধন করে। ধারণা করা হয় এরূপ খাবার খাদ্যনালির ক্যাপারের আশঙ্কা অনেকাংশে হ্রাস করে। আঁশযুক্ত খাবার স্থূলতা হ্রাস, ক্ষুধা প্রবণতা হ্রাস ও চর্বি জমার প্রবণতা হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আদর্শ খাদ্য পিরামিড

যেকোনো একটি সুখম খাদ্য তালিকায় শর্করা, শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ ও স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য অন্তর্ভুক্ত। একজন কিশোর বা কিশোরী, প্রাপ্ত বয়স্ক একজন পুরুষ বা মহিলার সুখম খাদ্য তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, শর্করাকে নিচু স্তরে রেখে পর্যায়ক্রমে পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ, স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয় তাকে আদর্শ খাদ্য পিরামিড বলে। চিত্রে এই পিরামিডের শীর্ষে রয়েছে স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য আর সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে শর্করা।

আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় খাবার তালিকায় যেসব খাবার থাকে তা পিরামিডের আকারে দেখানো হলো। খেয়াল করে দেখ, পিরামিডের অংশগুলো তার আকার অনুযায়ী নিচের দিকে বড়, উপরের দিকে ছোট। সবচেয়ে চওড়া অংশ



চিত্র ৫.৪: আদর্শ খাদ্য পিরামিড

ভাত, আলু, রুটি এসব। এগুলো বেশি করে খেতে হবে। তার পরের অংশে আছে শাকসবজি ও ফলমূল। এসব ভাত, রুটির চেয়ে কম খেতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, পনির, ছানা, দই আরও কম পরিমাণে খেতে হবে। তেল, চর্বি ও মিষ্টি জাতীয় খাবার সবচেয়ে কম খাওয়া উচিত। আমাদের প্রতিদিনের খাবার খাদ্য পিরামিড অনুযায়ী বেছে নিতে হবে, তবেই আমরা সহজে সুস্থ খাদ্য নির্বাচন করতে পারব। খেতে ভালো লাগলে অনেক সময় আমরা অনেক বেশি খাদ্য খেয়ে নেই। সুস্বাস্থ্যের জন্য এ অভ্যাস কল্যাণকর নয়। তাই আমাদের পরিমিত পরিমাণে আহাৰ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সে সঙ্গে খাদ্য গ্রহণের নিয়মনীতি ও সময় মেনে চলতে হবে।

খাদ্য গ্রহণের নীতিমালা (Healthy Eating)

খাদ্য উপাদান বাছাই বা আহাৰ সুস্থ করা উন্নত জীবনযাপনের একটি পূর্বশর্ত। খাদ্যগ্রহণ নীতিমালা বা নিয়মনীতি প্রত্যেকের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ নীতিমালা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকলে খাদ্য নির্বাচন, খাদ্যের পুষ্টিমান, ক্যালরি, পারিবারিক আয় ইত্যাদি সম্পর্কে নজর রেখে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের খাদ্য চাহিদা মেটানো সহজতর হয়। এসব কার্যক্রম খাদ্যগ্রহণ নীতিমালার অন্তর্গত।

সুস্থ খাদ্যের বৈশিষ্ট্য

১. একজন মানুষের বিপাকের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের সামর্থ্য থাকতে হবে।
২. খাদ্যে আমিষ, চর্বি ও শর্করার অনুপাত হবে ৪ : ১ : ১।
৩. খাদ্যে প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও রাফেজ বা সেলুলোজ সরবরাহের জন্য সুস্থ খাদ্য তালিকায় ফল ও টটকা শাকসবজি থাকতে হবে।
৪. খাদ্যে অবশ্যই প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও খনিজ লবণ থাকতে হবে।
৫. সুস্থ খাদ্য অবশ্যই সহজপাচ্য হতে হবে।

সুস্থ সবল ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য সুস্থ খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। দেহের পরিপুষ্টির জন্য ছয় উপাদানবিশিষ্ট খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে সুস্থ খাদ্যের তালিকা বা মেনু পরিকল্পনা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেহের চাহিদা, খাদ্যের সহজলভ্যতা ও পারিবারিক আয় এ তিনটি বিষয় বিবেচনা করে খাদ্য উপাদান বাছাই বা মেনু পরিকল্পনা করলে তা বাস্তবমুখী হয়। সমান পুষ্টিমানের কম দামী খাবার দিয়েও মেনু পরিকল্পনা করা যায়। তবে সমমানের উপাদান সম্বলিত বেশি দামের খাদ্যের পরিবর্তে কম দামী খাদ্য নির্বাচন করে সুস্থ খাদ্য গ্রহণের মানসিকতা থাকা ভালো।

সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি

সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরির জন্য কতগুলো বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ রাখা প্রয়োজন। যেমন—

- △ ব্যক্তি বিশেষের লিঙ্গ, বয়স, পেশা ও শারীরিক অবস্থা;
- △ খাদ্যের মূল্যমান সম্পর্কে জ্ঞান;
- △ দেহের ক্ষয়পূরণ ও গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;
- △ খাদ্যে পরিমাণমতো ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির উপস্থিতি;
- △ স্বাস্থ্য, আবহাওয়া ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে জ্ঞান;
- △ পরিবারের আর্থিক সজ্জাতি ও সদস্য সংখ্যা।

নিচের সারণিগুলো পর্যবেক্ষণ কর। এ থেকে তোমরা বিভিন্ন বয়সী নর-নারীর খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ ও ক্যালরি চাহিদা সম্পর্কে ধারণা পাবে।

তালিকা (ক) : পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার জন্য সুষম খাদ্য তালিকা

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার দেহে প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার ক্যালরি পেতে হলে তালিকায় উল্লিখিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হবে। কিশোর ও যুবা বয়সী ছেলেমেয়েদের বয়স অনুযায়ী পরিমাণে একটু কম খেলেও চলবে।

পূর্ণবয়স্ক পুরুষ				পূর্ণবয়স্ক মহিলা		
খাদ্যশস্যের নাম	পরিশ্রমহীন (গ্রাম)	মোটামুটি পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমহীন (গ্রাম)	মোটামুটি পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমী (গ্রাম)
সিম/বরবটি	২০	২৫	৩০	২০	২২.৫	২৫
ডিম/মাছ/মাংস	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম
পাতায়ুক্ত শাক	৪০	৪০	৪০	১০০	১০০	১৫০
অন্যান্য সবজি	৬০	৭০	৮০	৪০	৪০	১০০
মূল ও আলু	৫০	৬০	৮০	৫০	৫০	৬০
দুধ	১৫০	২০০	২৫০	১০০	১৫০	২০০
তেল/চর্বি	৪৫	৫০	৭০	২৫	৩০	৪৫
চিনি/গুড়	৩০	৩৫	৫৫	২০	২০	৪০

তালিকা (খ) : বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যসমূহের পুষ্টিমান

বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যশস্যসমূহের খাদ্যমান বা পুষ্টিমানের উপর ভিত্তি করে এ ছকটি তৈরি করা হয়েছে। এটি The Institute of Nutrition and Food Science (INFS, 1975) কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রকাশিত একটি ছক। প্রতি ১০০ গ্রাম গ্রহণযোগ্য খাদ্যশস্যের ভিত্তিতে পুষ্টিমান নির্ধারণ করা হয়েছে।

খাদ্যবস্তুর নাম	আমিষ (গ্রাম)	তেল/চর্বি (গ্রাম)	মিনারেল (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	শক্তি (কিলোক্যালরি)
চাল	৬.৪	০.৪	০.৭	৭৯.০	৩৪৬
গম (আটা)	১২.১	১.৭	২.৭	৬৯.৪	৩৪১
ছোলা	১৭.১	৫.৩	৩.০	৬০.৯	৩৬০
মসুর	২৫.১	০.৭	২.১	৫৬.০	৩৪৩
গাজর	০.৯	০.২	১.১	১০.৬	৪৮
গোল আলু	১.৬	০.১	০.৬	২২.৬	৯৭
কলমিশাক	২.৯	০.৪	২.১	৩.১	২৮
পুঁইশাক	২.০	০.৭	১.৭	২.৯	২৬
কুমড়া (ছোট)	২.১	১.০	১.৪	১০.৬	৬০
বেগুন	১.৪	০.৩	০.৩	৪.০	২৪
ফুলকপি	২.৬	০.৪	১.০	৪.০	৩০
বাঁধাকপি	১.৮	০.১	০.৬	৪.৬	২৭
বরবটি	২.৫	০.১	২.০	৩.৭	২৬
শিম	৭.২	০.১	০.৪	১৫.৯	৯৬
ইলিশ মাছ	২১.৮	১৯.৪	২.২	২.৯	২৭৩
কাতলা মাছ	১৯.৫	২.৪	১.৫	২.৯	১১১
চিংড়ি	১৯.১	১.০	১.৭	০.৮	৮৯
গো-মাংস	২২.৬	২.৬	১.০	-	১১৪
ডিম	১৩.৩	১৩.৩	১.০	-	১৭৩
মুরগির মাংস	২৫.৯	০.৬	১.৩	-	১০৯
খাসির মাংস	১৮.৫	১৩.৩	১.৩	-	১৯৪
গরুর দুধ	৩.২	৪.১	০.৮	৪.৪	৬৭
মায়ের দুধ (মানুষ)	১.১	৩.৪	০.১	৭.৪	৬৫
গরুর দুধের ঘি	-	১০০.০০	-	-	৯০০
রান্নার তেল	-	১০০.০০	-	-	৯০০

এছাড়া অন্যান্য যে বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে তা হলো—

- △ খাদ্য তৈরি, পরিবেশন ও গ্রহণের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- △ দৈনিক ৭-৮ গ্লাস পানি পান করা। পানি অবশ্যই ফুটিয়ে পান করতে হবে।
- △ টাটকা সবুজ শাকসবজি, মৌসুমি ফলমূল গ্রহণ। প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় এগুলো থাকা আবশ্যিক। টিনজাত ও হিমায়িত শাকসবজি না খাওয়াই উত্তম।

কাঙ্ক্ষ : শিক্ষার্থী তার ৭ দিনের গৃহীত খাদ্যের একটি তালিকা তৈরি করে এটিকে সুস্থ খাদ্যের সাথে তুলনা করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

গুটির অভাবজনিত রোগ

গলগন্ড (Goitre) : গলগন্ড থাইরয়েড গ্রন্থির একটি রোগ। খাবারে আয়োডিনের অভাব থাকলে থাইরয়েড গ্রন্থিটির আয়তন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়ে গলগন্ডের সৃষ্টি করে। সমুদ্র থেকে দূরে পার্বত্য এলাকার মাটিতে আয়োডিন কম থাকায় এসব অঞ্চলের শিশুদের এই রোগ বেশি দেখা যায়। গলগন্ড দুই রকম, যথা— ১. সরল গলগন্ড ও ২. টক্সিক গলগন্ড।

১. সরল গলগন্ড : আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যায় অথবা গ্রন্থি দুটির যেকোনো একটি ফুলে যায়। ফলে গলার কিছু অংশ ফুলে নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। একে সরল গলগন্ড বলে।

আলসেমি বা কুঁড়েমি, নিদ্রাহীনতা, শুকনো চামড়া, ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পারা, ছোট শিশুদের মানসিক প্রতিবন্ধকতা, পড়াশুনায় অমনোযোগী হওয়া এ রোগের লক্ষণ। থাইরয়েড গ্রন্থি বেশি ফুলে গেলে রোগীর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

যে অঞ্চলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব আছে সে অঞ্চলের খাওয়ার পানির সাথে অতি সামান্য মাত্রায় আয়োডিন মেশানো যেতে পারে।



চিত্র ৫.৫: গলগন্ড রোগী

২. টক্সিক গলগন্ড : অতিমাত্রায় থাইরক্সিন নামক হরমোন নিঃসরণের ফলে এ রোগ হয়। এ রোগের লক্ষণগুলো হলো— হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, বুক ধড়ফড় করা, ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া ও অধিক ঘাম হওয়া।

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন দ্বারা এ গ্রন্থির বৃদ্ধি রোধ করা হয়। আয়োডিনযুক্ত খাবার খাওয়া, যেমন— সামুদ্রিক শৈবাল, সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি।

রাতকানা (Night Blindness) : ভিটামিন ‘এ’ এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। সাধারণত দুই থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা দেয়। চোখের সম্ভাব্য ‘রড’ কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, স্বল্প আলোতে ভালো দেখা যায় না। চোখে সবকিছু ঝাপসা দেখা যায়। রোগটি বেড়ে গেলে কর্ণিয়া ঘোলাটে হয়ে যায়। এগুলো রাতকানা রোগের লক্ষণ।

ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন— মাছের যকৃতের তেল, কলিজা, সবুজ শাকসবজি, রঙিন ফল (পাকা আম, কলা, মিষ্টি কুমড়া, গাজর ইত্যাদি) ও মলা-ঢেলা মাছ খাওয়া, প্রয়োজনে ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খেতে দেয়া। উক্ত নিয়মগুলো মেনে চললে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

রিকটস (Rickets) : এটি কোনো ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ নয়। ভিটামিন ‘ডি’ এর অভাবে এ রোগ হয়। অল্পে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণ, দাঁত ও হাড় গঠন প্রভৃতি শারীরবৃত্তীয় কাজে এ ভিটামিন প্রয়োজন। দুধ, মাখন, ডিম, কডলিভার তেল ও হাঙ্গরের তেলে প্রচুর ভিটামিন ‘ডি’ পাওয়া যায়। সূর্যের বেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের ত্বকেও এটি তৈরি হয়।

দেহের হাড়গুলো দুর্বল হওয়া, গাঁট ফুলে যাওয়া, হাড়গুলো বিশেষ করে পায়ের হাড় বঁকে যাওয়া, অনেক সময় সরু হাড়গুলো ভাঁজ খেয়ে যাওয়া এ রোগের লক্ষণ। এছাড়া অনেক সময় দেহের কাঠামো ঠিক রাখা যায় না, হাড়গুলো ভাঙুর হয়ে যায় ও বন্ধদেশ সরু হয়ে যায়।

শিশুদের পর্ষাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ‘ডি’ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে। নবজাতককে কিছুক্ষণ রোদে রাখা ভালো। এতে সূর্যালোকের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভিটামিন ‘ডি’ তৈরি হয়।

রক্তশূন্যতা (Anemia) : আমাদের দেশে শিশু ও মহিলাদের রক্তাঙ্গতা বা রক্তশূন্যতা একটি সাধারণ রোগ। রক্তশূন্যতা হচ্ছে দেহের এমন একটা অবস্থা যখন বয়স এবং লিঙ্গভেদে রক্তে হিমোগ্লোবিনের ঘনত্ব স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়, খাদ্যের মুখ্যউপাদান ভিটামিন বি_{১২} এর অভাব ঘটলে এ রোগ দেখা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত লৌহঘটিত আমিষের অভাবে এই রোগ হয়। শিশুদের ও গর্ভধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মহিলাদের এই রোগ বেশি হয়। লৌহের ঘাটতি জনিত-রক্তাঙ্গতা বা রক্তশূন্যতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমন- অত্যধিক রক্তপাত ঘটলে, ক্রিমির আক্রমণে, লৌহ গঠিত খাদ্য উপাদান যথাযথ শোষণ না হলে, বাতুল শিশু বা গর্ভবতী মহিলাদের খাদ্যে লৌহের পরিমাণ কম থাকলে, অল্পে সংক্রমণ ঘটলে, কম বয়সী শিশুদের খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ লৌহের অভাব হলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা দেয়। যেমন- দুর্বলতা অনুভব করা, মাথাব্যথা, মনমরা ভাব, অনিদ্রা, চোখে অন্ধকার দেখা, খাওয়ায় অরুচি, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি।

এ রোগ প্রতিরোধের জন্য লৌহ সমৃদ্ধ খাবার, যেমন- যকৃত, মাংস, ডিম, চিনাবাদাম, শাকসবজি, বরবটি, মশুরডাল, খেজুরের গুড় খাওয়া। পরীক্ষা দ্বারা অল্পে ক্রিমির বা হুকওয়ার্ম-এর সংক্রমণ নিশ্চিত হয়ে ক্রিমিনাশক ঔষধ সেবন করা। প্রয়োজন হলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী লৌহ উপাদানযুক্ত ঔষধ সেবন করে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়।

কাজ : স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জীবনযাপনে পুষ্টির অবদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অংকন কর।

পুষ্টি উপাদানে শক্তি

আমরা জানি যে, খাদ্য আমাদেরকে পুষ্টি ও শক্তি দেয়। কিন্তু আমরা কি একথা জানি, কী পরিমাণ খাদ্য উপাদান থেকে কী পরিমাণ শক্তি পাই? আবার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণও কি এক? খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদানের মধ্যে শুধুমাত্র শর্করা, প্রোটিন এবং চর্বি জাতীয় উপাদান শক্তি দিতে পারে। বাকি উপাদান তিনটি শক্তি দিতে পারে না।

তোমরা জান শক্তির বিভিন্ন রূপ রয়েছে। পুষ্টি উপাদান থেকে নির্গত শক্তি হচ্ছে তাপশক্তি। তাপশক্তির একক হচ্ছে ক্যালরি। এক কিলোগ্রাম (১০০০ গ্রাম) পানির উষ্ণতা ১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করতে এক ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়। আসলে এটা হলো কিলোক্যালরি। কিন্তু পুষ্টিবিদগণ একে সাধারণভাবে ক্যালরি বলে থাকেন।

দেহের মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণের উপর শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। যে কাজে মাংসপেশি যত বেশি সংকোচিত ও প্রসারিত হয় সে কাজে তত বেশি শক্তি ব্যয় হয়।

আমাদের দেহের মাংসপেশি আমাদের চলনে সাহায্য করে। মাংসপেশির কারণে আমরা চলতে, ফিরতে, হাঁটতে, দৌড়াতে, বসতে ইত্যাদি কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। মাংসপেশির এ ধরনের কাজে সহায়তার জন্য কী পরিমাণ শক্তি খরচ হয়?

পেশির সংকোচন প্রসারণে শক্তি দরকার হয়। সুতরাং, মাংসপেশি যতবেশি সংকোচিত ও প্রসারিত হবে শক্তিও তত বেশি খরচ হবে। তাই কাজের উপর নির্ভর করে শক্তি ব্যয়ের পরিমাণ। তবে কি হাঁটা, চলা ও নড়াচড়া না করলে শক্তি খরচ হয় না?

আমরা যদি কোনো কাজ না করি, শুধু শুয়ে বসে থাকি, তবুও আমাদের খাদ্যের দরকার হয়, ক্ষুধা লাগে, বিশ্রামরত অবস্থায়ও শক্তি খরচ হয় বলে মনে হয়। কিন্তু কীভাবে?

বিশ্রামাবস্থায় আমাদের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন-হাত, পা কাজ করে না, কিন্তু আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড ঠিকই চলে। এদের সাথে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলোর সংকোচন প্রসারণে সার্বিক কাজ সাধিত হয়। কাজেই তখনই শক্তি ব্যয় হতে থাকে। এই শক্তিকে মৌলবিপাক শক্তি বলে। একজন লোকের দৈনিক কী পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা প্রধানত

নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর। ১. মৌলবিন্যাস ২. দৈহিক পরিশ্রমের ধরন ও ৩. খাদ্যের প্রভাব। এছাড়া দেহের বৃদ্ধির শারীরিক অবস্থা ও আবহাওয়ার উপরও ক্যালরির চাহিদা নির্ভর করে।

খাদ্য শক্তির মূল্য নির্ণয়ের আন্তর্জাতিক একক

জুল (Joule)

$$১০০০ জুল = ১ কিলোজুল$$

$$১০০০ কিলোজুল = ১ মেগাজুল$$

$$১ কিলোক্যালরি = ৪১৮০ জুল \\ = ৪.১৮ কিলোজুল$$

$$১ মেগাজুল = .০০৪১৮ মেগাজুল$$

উদাহরণ

$$২৮০০ কিলোক্যালরি = কত জুল?$$

$$২৮০০ কিলোক্যালরি = ২৮০০ \times ৪১৮০ জুল \\ = ২৮ \times ৪.১৮ কিলোজুল \\ = ১১.৭ কিলোজুল$$

আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে, খাদ্যের শক্তিমূল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কিলোক্যালরির পরিবর্তে কিলোজুল ব্যবহার করা উচিত। এক্ষেত্রে ১০০০ কিলোক্যালরি = ৪.২ কিলোজুল (প্রায়)।

পুষ্টি উপাদানে তাপশক্তি নির্ণয় : প্রতিদিন আমরা নানা রকম পুষ্টি উপাদান খেয়ে থাকি। ভাত, খিচুড়ি, পোলাও, মাংস থেকে শুরু করে ফলমূল, শাকসবজি, পানীয় ইত্যাদির কোনোটিই বাদ যায় না। তাই পুষ্টি উপাদানে শক্তি পরিমাপ করতে হলে এর প্রকৃতি জেনে নিতে হবে।

পুষ্টির প্রকৃতি মিশ্র খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাদ্য : খাদ্যের প্রকৃতি বলতে এটা কি মিশ্র খাদ্য, নাকি বিশুদ্ধ খাদ্য তাকে বুঝায়। মিশ্র খাদ্যে একের অধিক পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান থাকে। যেমন- দুধ, ডিম, খিচুড়ি, পেয়ারা ইত্যাদি। অন্যদিকে বিশুদ্ধ খাদ্যে শুধুমাত্র একটি উপাদান থাকে। যেমন- চিনি, গ্লুকোজ। এতে শর্করা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না।

পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ নির্ণয় : পুষ্টি উপাদানের প্রকৃতি জানার পর ঐ খাদ্যে কী কী উপাদান কী পরিমাণে আছে তা জেনে নিতে হবে। তবে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ খাদ্য মূল্য তালিকা দেখে জেনে নিতে হয়।

ক্যালরি নির্ণয় : খাদ্যের পুষ্টি উপাদান ও তার পরিমাণ জানার পর শর্করা, প্রোটিন ও চর্বি ক্যালরি বের করতে হয়। এক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানির ক্যালরি মূল্য শূন্য ধরে হিসাব করতে হবে। ধরা যাক, ২০ গ্রাম চিড়ার ক্যালরি নির্ণয় করতে হবে। তালিকায় প্রদত্ত উপাদান ও পরিমাণ অনুযায়ী ২০ গ্রাম চিড়ায়-

$$১৫.৪ গ্রাম শর্করা (৭৭\%)$$

$$১.৩২ গ্রাম প্রোটিন (৬৬\%)$$

$$০.২৪ গ্রাম স্নেহ (১.২\%) আছে।$$

তাহলে, সূত্রানুসারে-

১৫.৪ গ্রাম শর্করা থেকে $১৫.৪ \times ৪ = ৬১.৬০$ ক্যালরি

১.৩২ গ্রাম প্রোটিন থেকে $১.৩২ \times ৪ = ৫.২৮$ ক্যালরি

০.২৪ গ্রাম স্নেহ থেকে $০.২৪ \times ৯ = ২.১৬$ ক্যালরি

অতএব, মোট ক্যালরি = ৬৯.০৪

এ হিসাবে, ১ কেজি চিড়ার ক্যালরি = $\frac{৬৯.০৪ \times ১০০০}{২০}$

= ৩৪৫২.০০

= ৩৪৫২ ক্যালরি

১০০০ কিলোক্যালরি = ৪.২ কিলোজুল

অতএব, ৩৪৫২ ক্যালরি = ১৪.৪৯ কিলোজুল (প্রায়)।

বিএমআর (BMR) এবং বিএমআই (BMI)

বেসাল মেটাবলিক রেট (BMR) পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থায় মানব শরীরে ব্যবহৃত শক্তির পরিমাণ নির্দেশ করে। বডি মাস ইনডেক্স (BMI) মানব দেহের গড়ন ও চর্বি একটি সূচক নির্দেশ করে। অর্থাৎ সুস্থ জীবনযাপনে মানব শরীরের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় কোনো নির্দিষ্ট বয়সে শরীরের দৈর্ঘ্যের সাথে চর্বির পরিমাণগত সম্পর্ক মান নির্দেশ করে। শরীরের সুস্থতা ও স্থূলতার মান নির্ণয়ে এই মানদণ্ড দু'টি খুবই উপযোগী।

বিএমআর মান নির্ণয়

বিএমআর মান বের করা একটু কঠিন, এর সমীকরণ লিখা ও বয়সভেদে পার্থক্য আছে। বিএমআর সম্পর্কে ধারণা পেতে বহুল ব্যবহৃত হ্যারিস বেনেডিষ্ট সূত্রটি ব্যবহার করা যায়।

মেয়েদের বিএমআর = $৬৫৫ + (৯.৬ \times \text{ওজন কেজি}) + (১.৮ \times \text{উচ্চতা সেমি}) - (৪.৭ \times \text{বয়স বছর})$

ছেলেদের বিএমআর = $৬৬ + (১৩.৭ \times \text{ওজন কেজি}) + (৫ \times \text{উচ্চতা সেমি}) - (৬.৮ \times \text{বয়স বছর})$

ধরা যাক একজন মহিলার বয়স ৩৩ বছর, উচ্চতা ১৬৫ সেমি এবং ওজন ৯৪ কেজি।

সুতরাং তার বিএমআর = $৬৫৫ + (৯.৬ \times ৯৪) + (১.৮ \times ১৬৫) - (৪.৭ \times ৩৩)$

= $৬৫৫ + ৯০২.৪ + ২৯৭ + ১৫৫.১$

= ১৬৯৯.৩ ক্যালরি

নিচের ছকটি ব্যবহার করে বিএমআর এর মান থেকে আমাদের দৈনিক ক্যালরির চাহিদা বের করা যায়।

শারীরিক অবস্থা	ক্যালরি মান
পরিশ্রমী না হলে	বিএমআর মান $\times ১.২$
হালকা পরিশ্রমী, সপ্তাহে ২-৩ দিন খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান $\times ১.৩৭৫$
পরিশ্রমী, সপ্তাহে ২-৩ দিন প্রচুর খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান $\times ১.৫৫$
পরিশ্রমী, সপ্তাহে প্রতিদিন প্রচুর খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান $\times ১.৭২৫$
অত্যন্ত পরিশ্রমী, প্রচুর দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলা করলে	বিএমআর মান $\times ১.৯$

উদাহরণ হিসেবে উপরের মহিলাটি পরিশ্রমী নয় বলে ধরা হলে তার বিএমআর মান ১৬৯৯.৩ হলে তার ক্যালরি চাহিদার মান (১৬৯৯.৩×১.২) বা ২০৩৯.১৬। অর্থাৎ প্রতিদিন ২০৩৯ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণে সেই মহিলাটি তার ওজন একই রাখতে পারবে।

বিএমআর ও ব্যয়িত শক্তির সম্পর্ক

বিএমআর মান বয়স, লিঙ্গ, খাদ্যাভ্যাস ও শরীরের গঠনের উপর নির্ভরশীল। আমাদের দৈনিক খাদ্য চাহিদার সাথে বিএমআর-এর মান নিয়ন্ত্রণ লক্ষ করা যায়। বিএমআর আমাদের শরীরের ৬০ থেকে ৭৫ ভাগ শক্তির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের শরীর খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে মাত্র ১০-২০ শতাংশ এবং শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ শক্তি পেয়ে থাকে। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে বিএমআর মান কমতে থাকে, আবার অনেকেই শূকনা থাকার জন্যে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে। এতে বিএমআর মান আরও কমে যায়, ফলে আর না খেয়ে শূকানো যায় না। যদি প্রতিদিন পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম করা হয় তাতে বিএমআর মান বেড়ে যায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শরীরকে সুস্থ সবল রাখা যায়।

বিএমআই মান নির্ণয়

বিএমআই = দেহের ওজন (কেজি) / দেহের উচ্চতা (মিটার)^২

উদাহরণ হিসেবে ১২৫ সেমি (১.২৫ মিটার) উচ্চতা এবং ৫০ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির বিএমআই হচ্ছে ৩২।

বিএমআই মানদণ্ড

মান নির্দেশিকা

১৮.৫ এর নিচে শরীরের ওজন কম, পরিমিত খাদ্য গ্রহণে ওজন বাড়াতে হবে।

১৮.৫-২৪.৯ সুস্বাস্থ্যের আদর্শ মান।

২৫-২৯.৯ শরীরের অতিরিক্ত ওজন, ব্যায়াম করে অতিরিক্ত ওজন কমানো প্রয়োজন।

৩০-৩৪.৯ মোটা হওয়ার প্রথম স্তর, বেছে খাদ্যগ্রহণ ও ব্যায়াম করা প্রয়োজন।

৩৫-৩৯.৯ মোটা হওয়ার দ্বিতীয় স্তর, পরিমিত খাদ্যগ্রহণ ও এক্সারসাইজ করা প্রয়োজন।

৪০ এর উপরে অতিরিক্ত মোটাত্ব, মৃত্যুবৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা, ডাক্তারের পরামর্শের প্রয়োজন।

বিএমআই মানদণ্ডে ব্যক্তির সুস্বাস্থ্যের জন্যে ৩৮ কেজি ওজন হওয়া প্রয়োজন। অতএব সঠিক পুষ্টি গ্রহণ ও ব্যায়ামের মাধ্যমে ওজন স্বাস্থ্যসম্মত মানে নিয়ে যেতে হবে।

শরীরচর্চা ও বিশ্রাম

সুস্থ জীবনের জন্য প্রতিদিন সকলেরই পরিমিত পরিশ্রম করা উচিত। ইত্যাদি কারণে শরীরকে সবল রাখতে চেষ্টা করি। বর্তমানে কাজের ধারা, পড়াশুনার চাপ, খেলার মাঠের অপ্রতুলতা আমরা খুব কমই হাঁটাচলা কিংবা দৌড়া-দৌড়ি করি ফলে আমাদের স্থূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শরীর সুস্থ, সবল থাকছে না এবং আমরা কর্মবিমুখ হয়ে পড়ছি। পরিমিত শরীর চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের শরীরের কার্যক্ষমতা অটুট রেখে সুস্থ থাকতে পারি। দেখা গেছে যারা প্রতিদিন এক ঘণ্টা মাঝারি মানের শরীরচর্চা করে, পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করে, তারাই হাসিখুশি জীবনযাপন করে এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করে। শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহের অতিরিক্ত ওজন কমানো সম্ভব। শরীরচর্চার ফলে ডায়াবেটিস রোগ, হৃদরোগ ও কয়েক প্রকার ক্যান্সার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রকমের শরীরচর্চা আছে। যেমন, কসরত, পেশি ও অস্থি গঠন ইত্যাদি। নানাভাবে শরীরচর্চা করা যায়। জোরে হাঁটা, জগিং, দৌড়, সাঁতারকাটা, খেলাধুলা করা, সাইকেল চালানো ইত্যাদি শরীরচর্চার অংশ।

আমাদের শরীরের জন্য বিশ্রাম অত্যন্ত জরুরি বিষয়। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের পরই বিশ্রাম প্রয়োজন। শূয়ে থাকা,

ঘুমানো ইত্যাদি বিশ্রামের অংশ। বিশ্রামের ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ পুনঃশক্তি সঞ্চয় করে। জানলে আশ্চর্য হতে হয় যে জীবজগতের প্রায় প্রতিটি প্রাণীই বিশ্রাম নেয়। এই বিশ্রাম দিন ও রাত্রির চক্রের সাথে সম্পৃক্ত। অনেক প্রাণী আছে যারা সূর্যালোকে কর্মক্ষম থাকে। আবার অনেক প্রাণী আছে যারা দিনে বিশ্রাম নেয় কিন্তু রাতে কর্মক্ষম হয়ে খাদ্যের খোঁজে বের হয়। এদের নিশাচর বলে।

খাদ্যদ্রব্য সঞ্চারে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার

খাদ্য সঞ্চারে এমন এক প্রক্রিয়া যাতে খাদ্যের পচন রোধ করা হয়। ফলে খাদ্যের গুণাগুণ, গ্রহণযোগ্যতা ও খাদ্যমান অটুট থাকে। খাদ্য সঞ্চারে সাধারণত পচনসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক সংক্রমণ এবং খাদ্যের চর্বিজাতীয় অংশের জারণ রোধ করা হয়।

মাছের শাঁটকিকরণ, লোনা ইলিশ, আঁচার, বরফ সংরক্ষণ, চিথড়ির নাপতে, মাছের শীতল ইত্যাদি সবই খাদ্য সঞ্চারের বিভিন্ন প্রচলিত উপায়। অধুনা খাদ্যদ্রব্যের ক্যানিং বা কৌটাজাত, ধোঁয়ার মাধ্যমে স্মোকিং প্রভৃতি প্রক্রিয়া খাদ্য সঞ্চারে ব্যবহার করা হয়। খাদ্য সঞ্চারে বিভিন্ন স্বাস্থ্যসম্মত অনুমোদিত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় যাতে খাদ্যদ্রব্যে পচনসৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক সংক্রমণ করতে না পারে। সাধারণত সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড বা খাবার লবণ, ক্যালসিয়াম এপারনেট, সালফার ডাই-অক্সাইড, সোডিয়াম বাইসালফেট, এসিট-অক্সিডেন্ট যেমন BHA ও BHT খাদ্যদ্রব্য সঞ্চারে অনুমোদিতভাবে ব্যবহার করা হয়। তবে স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে ক্ষতিকারক ফরমালিন, বিভিন্ন রকমের রঞ্জক পদার্থ ইত্যাদি খাদ্য সঞ্চারে ব্যবহার করা উচিত নয়।

খাদ্যে ভেজাল ও রঞ্জক ব্যবহার

এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের নির্মল পরিবেশের যেমন প্রয়োজন তেমনি নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। বর্তমানে বাজারে অনৈতিকভাবে খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর ও অস্বাস্থ্যকর রাসায়নিক দ্রব্য ভেজাল ও রঞ্জক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করে তা বিক্রি করা হয়। এর ফলে জনস্বাস্থ্য এখন হুমকির সম্মুখীন। স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের এই ঝুঁকির ধারা চলতে থাকলে রোম জাতির ন্যায় হয়তো বাঙালি জাতি কালের আবর্তনে একসময় বিলীন হয়ে যেতে পারে। একসময় রোমবাসী যে পানীয় আধার ব্যবহার করত তা সিসার তৈরি ছিল। যার ফলে পানকারী কোনো না কোনোভাবে সিসার বিষাক্ততার শিকার হয়েছে এবং বিকলাঙ্গ প্রজন্মের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভেজাল মেশান হয়। এর মধ্যে মূলত বাণিজ্যিক রঙ, এসিটবায়োটিক, রাসায়নিক দ্রব্য (যেমন, সরবেট, কার্বাইড, কীট ও বালাইনাশক, ফরমালিন, হেভি মেটাল) উল্লেখযোগ্য। যেসব মাছ, গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগি ইত্যাদি অননুমোদিত দ্রব্য দিয়ে তৈরি খাদ্য খাওয়ানো হয় তা মানব শরীরের জন্য হুমকিস্বরূপ। এই ভেজালযুক্ত নিষিদ্ধ খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। স্বাস্থ্যঝুঁকির কয়েকটি ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরা হলো। বাণিজ্যিক রঙ যা কাপড় কিংবা রঙের কাজে ব্যবহার করা হয়, তা বিভিন্ন প্রকার খাদ্য যেমন আইসক্রিম, গোলা আইসক্রিম, লজ্জেল, বেগুণি, বড়া ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই জাতীয় খাবার ধীরে ধীরে যকৃতের কার্যকারিতা নষ্ট করে নানাবিধ রোগের কারণ হয়। ফরমালিনে ডুবানো মাছ, ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে পচন সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া জন্ম নিতে পারে না বলে কয়েকদিন বেশ টাটকা দেখা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ফরমালিন মাছের কোষের সাথে যৌগ তৈরি করে ফেলে। মাছ ধোয়া হলেও ঐ যৌগটি মাছের দেহে থেকে যায়। যা পরে রান্না করা মাছের সাথে মানব দেহে প্রবেশ করে। এই বিষাক্ত যৌগ নানা রকম জটিল রোগের উপসর্গের কারণসহ অনেক ক্ষেত্রে ক্যানসার জাতীয় রোগের সৃষ্টি করে।

মজুদ খাদ্যে ও সবজিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কীটনাশকের বিষাক্ততার সময় নষ্ট হবার আগেই দ্রব্যাদি

বাজারজাত করলে বিষাক্ত খাদ্যের প্রভাবে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা থাকে। এতে শিশুরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। তাদের শরীরের বাড়ন্ত কোষে এই বিষাক্ত কীটনাশক বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে একদিকে যেমন শিশুর মনের বিকাশ ব্যাহত হয় অন্যদিকে তারা নানা রকমের অসুস্থতায় ভুগে থাকে।

খাদ্যে যেসব রাসায়নিক দ্রব্য ও ভেজাল থাকে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

ভেজাল/বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য	সম্ভাব্য উৎস	প্রতিকার
১. এন্টিবায়োটিক	মৎস ও পশুখাদ্যে ব্যবহারের ফলে প্রাণীর শরীরে জমা হয়।	শুধুমাত্র অনুমোদিত ঔষধ ব্যবহার করতে হবে।
২. হেভি মেটাল	মৎস্য ও পশুখাদ্যে ব্যবহৃত অখাদ্য উপাদান (যেমন ট্যানারির বর্জ্য) প্রাণীর শরীরে জমা হয়।	অখাদ্য উপাদান যেমন ট্যানারির বর্জ্য, কয়লা, মাটি, প্রাণীর বিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবহার পরিহার করা।
৩. বাণিজ্যিক রঙ	রঙের কারখানা প্রধান ব্যবহারকারী। আইসক্রিম, গোলা-আইসক্রিম, সরবত, রঙ্গিন পানীয়, ভাজা বড়া ইত্যাদিতে অননুমোদিত ব্যবহার।	শুধুমাত্র অনুমোদিত খাদ্যরঙ ব্যবহার করা।
৪. ফরমালিন	রঙিন ছবি ডেভেলপার স্টুডিও, লাশ সংরক্ষণের মর্গ ইত্যাদি প্রধান ব্যবহারকারী। মাছ, দুধ, ফল ইত্যাদি সংরক্ষণে অননুমোদিত ব্যবহার।	ফরমালিন ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা।
৫. কীটনাশক	শাক-সবজি উৎপাদনে বালাইনাশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে বিষাক্ততা অনেক ক্ষেত্রে রয়ে যায়। শূটকিতে ডিডিটির অননুমোদিত ব্যবহার।	কীটনাশকের বিষাক্ততা নষ্ট হবার পর শাক-সবজি বাজারজাত করা। শূটকিতে ডিডিটি ব্যবহার না করা।
৬. রাসায়নিক পদার্থ	কারবাইডসহ বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ কাঁচা ফল ও টমেটো পাকাতে অননুমোদিতভাবে ব্যবহার। সফট ও এনার্জি পানীয়জলে অতিরিক্ত সরবেটের অননুমোদিত ভাবে ব্যবহার।	ফলকে পরিপক্ব হতে সময় দেয়া, যাতে প্রকৃতিগতভাবে ফল পাকে। কারবাইড ব্যবহার না করা। পরিমিত মাত্রায় সরবেট ব্যবহার করা।
৭. জীবাণু	খাদ্য উৎপাদন কিংবা প্রস্তুতিকালে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জীবাণু খাদ্যে মিশে যেতে পারে।	বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিতকরণ।

পরিপাক : মানবদেহ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত। এই কোষগুলোকে সজীব ও কার্যকর রাখতে হলে সময়মতো খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য জটিল ও জৈব যৌগ অবস্থায় গ্রহণ করা হয়। দেহের কোষগুলো তা সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। খাদ্যকে শোষণযোগ্য ও কোষ উপযোগী করতে হলে তাকে ভেঙে সহজ, সরল ও তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করা আবশ্যিক।

পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System) : খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের কাজের জন্য মানবদেহে পরিপাকতন্ত্র বা পৌষ্টিকতন্ত্র নামে একটি স্বতন্ত্র তন্ত্র থাকে। যে তন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ভেঙে দেহের গ্রহণ উপযোগী উপাদানে পরিণত ও শোষিত হয় তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র বলে। এ তন্ত্রটি পৌষ্টিকনালি ও কয়েকটি গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত। পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে শুরু হয়ে পায়ুতে শেষ হয়।

দেহে দুভাবে খাদ্য শোষিত হবার উপযোগী হয় যথা:— ১. যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও ২. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়।

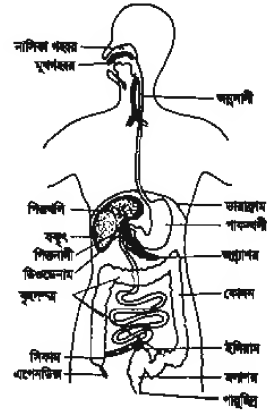
১. **যান্ত্রিক প্রক্রিয়া :** খাদ্যদ্রব্য মুখগহবরে দাঁতের সাহায্যে চিবানো হয়। প্রথমত চিবানোর কালে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়। পাকস্থলি ও অন্ত্রের মধ্যে এই টুকরো খাদ্যবস্তুগুলো মডে পরিণত হয়।
২. **রাসায়নিক প্রক্রিয়া :** রাসায়নিক প্রক্রিয়া পরিপাকের দ্বিতীয় ধাপ। পরিপাক রসের এনজাইম খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। এতে খাদ্যের জটিল উপাদানগুলো ভেঙে দেহে গ্রহণযোগ্য সরল উপাদানে পরিণত হয়। তাছাড়া কোষ মধ্যস্থক্রিয়া এই এনজাইমের উপর নির্ভরশীল।

পৌষ্টিকতন্ত্র বা পৌষ্টিকনালি : মুখগহবর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত এই নালিপথ কোথাও সরু আবার কোথাও প্রশস্ত।

এর প্রধান অংশগুলো নিম্নরূপ :

মুখ (Mouth) : মুখ দিয়ে পৌষ্টিকনালির শুরু হয়। এটি নাসারন্ধ্রের নিচে আড়াআড়ি একটি বড় ছিদ্র যা উপরে ও নিচে ঠোট দ্বারা বেষ্টিত থাকে।

মুখগহবর (Buccal cavity) : মুখের অভ্যন্তরে দাঁত, জিহবা ও লালগ্রন্থি থাকে। এগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। দাঁত খাদ্যকে চিবাতে সাহায্য করে এবং খাদ্যবস্তুকে ছোট ছোট অংশে পরিণত করে। জিহবা খাদ্যবস্তুকে নেড়েচেড়ে চিবাতে সাহায্য করে এবং স্বাদ গ্রহণ করে। মুখগহবরে অবস্থিত লালগ্রন্থি থেকে এনজাইম স্রবণ হয়। এই গ্রন্থিগুলো কানের নিচে চোয়ালের পাশে ও জিহবার নিচে অবস্থিত। লালগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসের মিউসিন খাদ্যকে পিচ্ছিল করে গলনক্রমে সাহায্য করে। লালারসের টায়ালিন ও মলটেজ নামক এনজাইম শর্করা পরিপাকে অংশ নেয়।



চিত্র ৫.৬: পরিপাকতন্ত্র

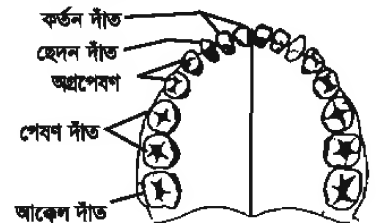
দাঁত (Tooth) : মানবদেহে সবচেয়ে শক্ত অংশ দাঁত। প্রাপ্ত বয়সে মুখগহবরের উপরে ও নিচের চোয়ালে সাধারণত ১৬টি করে মোট ৩২টি দাঁত থাকে। মানবদেহে দাঁত দুবার ওঠে। প্রথমবার শিশুকালে দুধদাঁত, দ্বিতীয়বার দুধদাঁত পড়ে গিয়ে ১৮ বছরের মধ্যে স্থায়ী দাঁত ওঠে।

মানুষের স্থায়ী দাঁত চার ধরনের। যথা—

ক. **কর্তন দাঁত (Incisor) :** এই দাঁত দিয়ে খাবার কেটে টুকরা করা হয়।

খ. **হেদন দাঁত (Canine) :** এই দাঁত দিয়ে খাবার ছেঁড়া হয়।

গ. **অগ্রপেশণ (Premolar) :** এই দাঁত দিয়ে চর্বণ, পেষণ উভয় কাজ করা হয়।



চিত্র ৫.৭: বিভিন্ন প্রকার দাঁত

ঘ. **পেষণ দাঁত (Molar) :** এই দাঁত খাদ্যবস্তু চর্বণ ও পেষণে ব্যবহৃত হয়। মাড়ির সবচেয়ে পেছনের বা শেষের দাঁত দুটোকে অনেক সময় আকেশ দাঁত বলা হয়। প্রতিটি চোয়ালের মাঝখানে দুটি কর্তন, একটি ছেদন, দুটি অগ্রপেষণ ও তিনটি করে পেষণ দাঁত থাকে।

দাঁতের গঠন : প্রতিটি দাঁতের তিনটি অংশ থাকে। যথা—

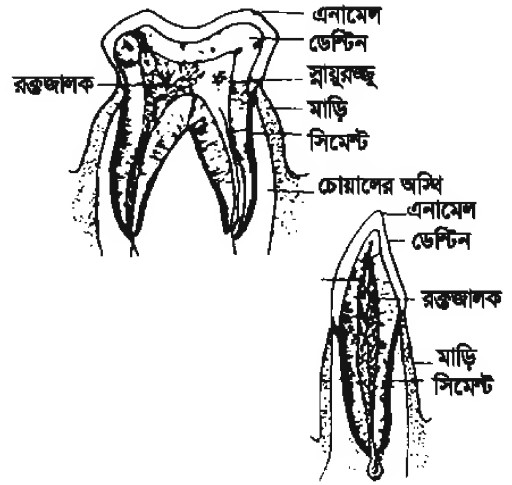
১. মুকুট : মাড়ির উপরের অংশ;
২. মূল : মাড়ির ভিতরের অংশ ও
৩. খিবা : দাঁতের মধ্যবর্তী অংশ।

প্রতিটি দাঁত যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তা হলো—

ক. **ডেন্টিন (Dentine) :** দাঁত প্রধানত ডেন্টিন নামক শক্ত উপাদান দ্বারা গঠিত।

খ. **এনামেল (Enamel) :** দাঁতের মুকুট অংশে ডেন্টিনের উপরিভাগে এনামেল নামক কঠিন উপাদান থাকে। এনামেল ও ডেন্টিন ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ও ফ্লোরাইড দিয়ে তৈরি।

গ. **দন্তমজ্জা (Pulp) :** ডেন্টিনের ভিতরের ফাঁপা নরম অংশকে দন্তমজ্জা বলে। এর ভিতরে ধমনি, শিরা, স্নায়ু ও নরম কোষ থাকে। দন্তমজ্জার মাধ্যমে ডেন্টিন অংশে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ হয়।



ঘ. **সিমেন্ট (Cement) :** সিমেন্ট নামক পাতলা আবরণ দাঁতের মূল অংশ ডেন্টিনকে আবৃত করে রাখে। এই সিমেন্টের সাহায্যে দাঁত মাড়ির সাথে আটকানো থাকে।

চিত্র ৫.৮: দাঁতের লম্বচ্ছেদ

গলবিল (Pharynx) : মুখগহবরের পরের অংশ গলবিল। মুখগহবর থেকে খাদ্যবস্তু গলবিলের মধ্য দিয়ে অন্ননালিতে পৌঁছে।

অন্ননালি (Oesophagus) : গলবিল থেকে পাকস্থলি পর্যন্ত বিস্তৃত নালিটির নাম অন্ননালি। খাদ্যবস্তু এই নালির মধ্য দিয়ে পাকস্থলিতে পৌঁছে।

পাকস্থলি (Stomach) : অন্ননালি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মাঝখানে একটি থলির মতো অঙ্গ। এর প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। পাকস্থলির প্রাচীরে অসংখ্য গ্যাস্ট্রিকগ্লান্থ থাকে। পাকস্থলির পেশি সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুকে গিথে মতে পরিণত করে। গ্যাস্ট্রিকগ্লান্থ থেকে নিঃসৃত রস খাদ্য পরিপাককে সহায়তা করে।

অন্ত্র (Intestine) : পাকস্থলির পরের অংশ অন্ত্র। এটি একটি লম্বা প্যাচানো নালি। অন্ত্র দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত। যথা:—

ক. **ক্ষুদ্রান্ত্র (Small Intestine) :** পাকস্থলি থেকে বৃহদন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা, প্যাচানো নালিকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র আবার তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা— ডুওডেনাম, জুজেনাম ও ইলিয়াম। ক্ষুদ্রান্ত্রের ডুওডেনামে পিত্তথলি থেকে ক্রমা-১০, জীববিজ্ঞান-৯ম-১০ম

পিত্তনালি এবং অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় নালি এসে মিলিত হয়। পিত্তনালির মাধ্যমে যকৃতের পিত্তরস এবং অগ্ন্যাশয়ের অগ্ন্যাশয় রস ডুওডেনামে এসে পৌঁছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে আঙুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। এদের ভিলাস বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে আন্ত্রিক গ্রন্থিও থাকে। ভিলাস পরিপাককৃত খাদ্য উপাদান শোষণ করে।

খ. বৃহদন্ত্র (Large Intestine) : ইলিয়ামের পর থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা নলাকৃতির অংশ হলো বৃহদন্ত্র। বৃহদন্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা— সিকাম, কোলন ও মলাশয়। সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স নামক ক্ষুদ্র নলের মতো প্রবৃন্দ্রি সংযুক্ত থাকে। বৃহদন্ত্রে মূলত পানি শোষিত হয়, মল তৈরি হয় ও মল জমা থাকে।

পায়ু : পৌষ্টিকনালির শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই হ্রদ্রপথই হলো পায়ু।

পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive glands) : যেসব গ্রন্থির রস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয় তাদেরকে পরিপাক বা পৌষ্টিকগ্রন্থি বলে। মানবদেহে পৌষ্টিকগ্রন্থিগুলো হলো—

ক. লালগ্রন্থি (Salivary glands) : মানুষের আছে তিন জোড়া লালগ্রন্থি; দুই কানের সামনে ও নিচে একজোড়া প্যারোটাইডগ্রন্থি, চোয়ালের নিচে সাব-ম্যাক্সিলারি ও চিবুকের নিচে একজোড়া সাব-লিঙ্গুয়ালগ্রন্থি পৃথক পৃথক নালির মাধ্যমে মুখগহবরে উন্মুক্ত হয়। লালগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস, লালা (Saliva) নামে পরিচিত। লালা রসে টায়ালিন নামক এনজাইম ও পানি থাকে।

খ. যকৃত (Liver) : মধ্যচ্ছদার নিচে উদর গহবরের উপরে পাকস্থলির ডান পাশে যকৃত অবস্থিত। এটি মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি। এর রং লালচে খয়েরি। যকৃতের ডান খন্ডটি বাম খন্ড থেকে আকারে কিছুটা বড়। প্রকৃতপক্ষে চারটি অসম্পূর্ণ খন্ড নিয়ে যকৃত গঠিত। প্রতিটি খন্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোবিউল দ্বারা তৈরি। প্রত্যেকটি লোবিউলে অসংখ্য কোষ থাকে। এ কোষ পিত্তরস (Bile) তৈরি করে। পিত্তরস ক্ষারীয় গুণ সম্পন্ন। যকৃতে বিভিন্ন রকম জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাই একে রসায়ন গবেষণাগার বলা হয়।

যকৃতের নিচের অংশ পিত্তথলি বা পিত্তাশয় সংলগ্ন থাকে। এখানে পিত্তরস জমা হয়। পিত্তরস গাঢ় সবুজ বর্ণের এবং তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট। পিত্তথলি পিত্তনালির সাহায্যে অগ্ন্যাশয় নালির সাথে মিলিত হয়। এটি যকৃত-অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে ডুওডেনামে প্রবেশ করে।

কাঙ্ক্ষ : পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র অংকন করে চিহ্নিত কর এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন কর।

যকৃতের কাঙ্ক্ষ

যকৃত পিত্তরস তৈরি করে। পিত্তরসের মধ্যে পানি, পিত্তলবণ, কোলেস্টেরল, পিত্তরস ও খনিজ লবণ প্রধান। এই রস পিত্তথলিতে জমা থাকে। প্রয়োজনে ডুওডেনামে এসে পরোক্ষভাবে পরিপাকে অংশ নেয়। পিত্তরসে কোনো উৎসেচক বা কোনো এনজাইম থাকে না। যকৃত উৎপাদিত গ্লুকোজ নিজ দেহে গ্লাইকোজেন রূপে সঞ্চয় করে রাখে। পিত্তরস খাদ্যের অম্লতাব প্রসমিত করে এবং ক্ষারীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই পরিবেশ খাদ্য পরিপাকের অনুকূল। কেননা আম্লিক পরিবেশে খাদ্য পরিপাক হয় না। পিত্তরস চর্বিজাতীয় খাদ্যকে ক্ষুদ্র দানায় পরিণত করে যা লাইগেজ সহযোগে পরিপাকে সহায়তা করে। অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিড যকৃতে আসার পর বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ও অ্যামোনিয়ারূপে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে এবং স্নেহ জাতীয় পদার্থ শোষণে সাহায্য করে। রক্তে কখনও গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে যকৃতের সঞ্চীত গ্লাইকোজেনের কিছুটা অংশ গ্লুকোজে পরিণত হয় ও রক্ত স্রোতে মিশে যায়। এভাবে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে।

অগ্ন্যাশয় (Pancreas) : অগ্ন্যাশয় পাকস্থলির পিছনে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ মিশ্রগ্রন্থি। এটি একাধারে পরিপাকে অংশগ্রহণকারী এনজাইম ও রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন নিঃসৃত করে। অর্থাৎ অগ্ন্যাশয় বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে। অগ্ন্যাশয় রস অগ্ন্যাশয় নালির মাধ্যমে যকৃত-অগ্ন্যাশয় নালিরূপে ডুওডেনামে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয় রসে ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক থাকে। এসব এনজাইম শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যের পরিপাকে সহায়তা করে। তাছাড়াও অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা, পানির সাম্যতা, দেহতাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের একটি অংশ অতি প্রয়োজনীয় কিছু হরমোন নিঃসরণ করে, যেমন- ইনসুলিন গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য শারীরবৃত্তীয় কাজে এ হরমোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি (Gastric glands) : গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি পাকস্থলির প্রাচীরে থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রস গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস নামে পরিচিত।

আন্ত্রিকগ্রন্থি (Intestine glands) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরে ভিলাই-এ আন্ত্রিকগ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসের নাম আন্ত্রিক রস।

খাদ্য পরিপাক ক্রিয়া (Digestion of Food) : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানুষের পৌষ্টিক নালির ফততরে জটিল, অদ্রবীয়, অশোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানসমূহ নির্দিষ্ট উৎসেচক বা এনজাইম এবং প্রাণরস বা হরমোনের উপস্থিতিতে বিশ্লেষিত হয়ে শোষণযোগ্য এবং দ্রবণীয় সরল উপাদানে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমত সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং পরবর্তীতে কোষ আবরণীর ভেতর দিয়ে অতি সহজে কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। অবশেষে রক্ত এ পরিপাককৃত সরল উপাদানগুলোকে দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে।

মুখে পরিপাক : মুখগহবরে খাদ্য, দাঁত ও জিহবার সাহায্যে চিবানোর ফলে খাদ্যবস্তু ছোট ছোট টুকরোয় পরিণত হয়। এ সময় লালগ্রন্থি থেকে লাল নিঃসৃত হয়ে খাদ্যের সাথে মিশে যায়। লাল খাদ্যবস্তুকে গলাধঃকরণে সাহায্য করে। লালায় টায়ালিন বা স্যালাইভারি অ্যামাইলেজ নামক উৎসেচক বা এনজাইম থাকে। এটি শ্বেতসারকে মলটোজে পরিণত করে। মুখগহবরে আমিষ বা স্নেহ জাতীয় খাদ্যের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না।

মুখগহবর থেকে খাদ্যদ্রব্য পেরিস্টালিসিস (Peristalsis) প্রক্রিয়ায় অনুনালির মধ্য দিয়ে পাকস্থলিতে প্রবেশ করে। পৌষ্টিক নালিগাত্রের পেশির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খাদ্যদ্রব্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়। অনুনালিতে খাদ্যের কোনো পরিপাক ক্রিয়া ঘটে না।

পাকস্থলিতে পরিপাক : পাকস্থলিতে খাদ্য আসার পর অন্তঃপ্রাচীরের গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক রস ক্ষরিত হয়। এই রসে প্রধান যে উপাদানগুলো থাকে তা হলো-

হাইড্রোক্লোরিক এসিড : হাইড্রোক্লোরিক এসিড খাদ্যের মধ্যে কোনো অনিষ্টকারী ব্যাকটেরিয়া থাকলে তা মেরে ফেলে। নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে এবং পাকস্থলিতে পেপসিনের সুষ্ঠু কাজের জন্য অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে।

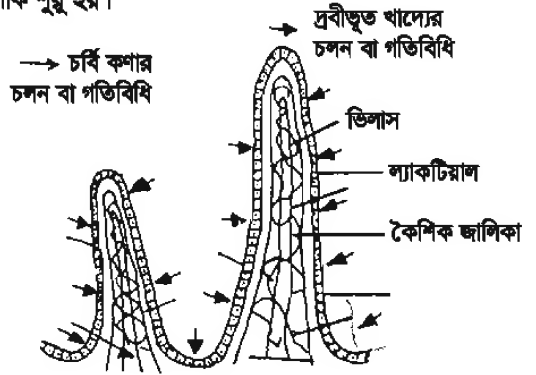
পেপসিন (Pepsin) : এক ধরনের এনজাইম যা আমিষকে ভেঙে দুই বা ততোধিক অ্যামাইনো এসিড দ্বারা তৈরি যৌগ গঠন করে যা পেপটাইড নামে পরিচিত।

শর্করা এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্য সাধারণত পাকস্থলিতে পরিপাক হয় না। কারণ এদের পরিপাকের জন্য গ্যাস্ট্রিক রসে নির্দিষ্ট কোনো এনজাইম থাকে না।

পাকস্থলিতে খাদ্যদ্রব্য পৌছানো মাত্র উপরোক্ত রসগুলো নিঃসৃত হয়। পাকস্থলির অনবরত সংকোচন ও প্রসারণ এবং এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে খাদ্য মিশ্র মণ্ডে পরিণত হয়। একে পাকমণ্ড বা কাইম (Chyme) বলে। এই মণ্ড অনেকটা স্যুপের মতো এবং কপাটিকা ভেদ করে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক : পাকস্থলি থেকে পাকমণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রের দুগুডেনামে প্রবেশ করে। এ সময় অগ্ন্যাশয় থেকে একটি ক্ষারীয় পাচকরস দুগুডেনামে আসে। এই পাচক রস খাদ্যমণ্ডের অম্লত্বাৎ প্রশমিত করে। পাচক রসের এনজাইম দ্বারা শর্করা ও আমিষ পরিপাকের কাজ চলতে থাকে এবং স্নেহ পদার্থের পরিপাক শুরু হয়।

পিত্তরস যুক্ত থেকে নিঃসৃত হয়। এটি অগ্নীয় অবস্থায় খাদ্যকে ক্ষারীয় করে পরিপাকের উপযোগী করে তোলে। পিত্তলবণ স্নেহ পদার্থের ক্ষুদ্র কণাগুলোকে পানির সাথে মিশতে সাহায্য করে। পিত্তলবণ পিত্তরসের অন্যতম উপাদান। লাইপেজের কাজ যথাযথ সম্পাদনের জন্য পিত্তলবণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এ লবণের সংস্পর্শে স্নেহ পদার্থ সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানায় পরিণত হয়। স্নেহ বিশ্লেষক লাইপেজ এই দানাগুলোকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।



চিত্র ৫.৯: ইলিয়ামে দ্রবীভূত খাদ্য ও স্নেহ পদার্থের শোষণ

অগ্ন্যাশয় রসে অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ, ট্রিপসিন নামক এনজাইম থাকে। আন্ত্রিক রসে আন্ত্রিক অ্যামাইলেজ, লাইপেজ, মলটেজ, ল্যাকটেজ ও শুক্রেজ ইত্যাদি এনজাইম থাকে। আন্ত্রিক পরিপাককৃত আমিষ ক্ষুদ্রান্ত্রে ট্রিপসিনের সাহায্যে ভেঙে অ্যামাইনো এসিড ও সরল পেপটাইডে পরিণত হয়।

পরিপাককৃত খাদ্য শোষণ : ক্ষুদ্রান্ত্রে সব ধরনের খাদ্যই সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট এনজাইমের ক্রিয়ায় পরিপাক হয়ে সরল, শোষণযোগ্য খাদ্য উপাদানে পরিবর্তিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত রক্তজালকসমৃদ্ধ আঙ্গুলের মতো প্রক্ষেপিত অংশ থাকে। একে ভিলাই বলে। প্রতিটি ভিলাসের মধ্যস্থলে ল্যাকটিয়াল নামক লসিকা জালক রক্তের কৈশিক নালি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। ভিলাই ভাঁজে ভাঁজে থাকায় ইলিয়ামের প্রাচীরগায়ে আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং পরিপাককার্য ব্যাপক ভাবে চলে।

এসব রক্তনালি যুক্ত হয়ে হেপাটিক শিরা গঠন করে। এই শিরা দিয়ে শোষিত রক্ত যকূতে আসে। স্নেহ পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা ভিলাসের ল্যাকটিয়ালে শোষিত হয়ে প্রথমে লসিকা দ্বারা বাহিত হয়ে রক্তস্রোতে মিশে। কোষে অণু প্রবেশের পর পিত্তলবণ ফ্যাটিএসিড থেকে পুনরায় পৃথক হয়ে যায়। কৈশিক নালির মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় নালির প্রাচীর ছুঁয়ে জলীয় পদার্থ বের হয়। এই জলীয় পদার্থকে লসিকা বলে। লসিকা খাদ্য উপাদান সরবরাহ করে কোষে পৌঁছে দেয় এবং দূষিত পদার্থ সঞ্চার করে রক্তস্রোতে ফিরে আসে। শোষণের পর পাকমণ্ডের অবশিষ্টাংশ কোলনে পৌঁছে।

বৃহদন্ত্রে পরিপাক : কোলনে পাকমণ্ডের কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া বা পরিপাক ঘটে না। তবে খাদ্যের অসার অংশের সাথে বে পানি থাকে তা এখানে শোষিত হয়। তাছাড়া থাকে কিছু আমিষ, লিপিড, লবণ এবং উদ্ভূত এনজাইম। এসব

বস্তু থেকে বৃহদন্ত্র লবণ ও পানি শোষণ করে রক্তে স্থানান্তরিত করে। ফলে উচ্ছ্বিত খাদ্য ঘনীভূত হয়ে মলে পরিণত হয়। এই মল মলাশয়ে জমা থাকে। অবশেষে প্রয়োজনমতো পাল্লুপথ দিয়ে বাইরে নির্গত হয়।

আন্তীকরণ : শোষিত খাদ্যবস্তুর প্রোটোপ্লাজমে পরিণত বা রূপান্তরিত করার পদ্ধতি হলো আন্তীকরণ। এটা একটি গঠন মূলক বা উপচিতি প্রক্রিয়া। কোষের প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের সহযোগিতায় সরল খাদ্য জটিল উপাদানে পরিণত হয়। যেমন— অ্যামাইনো এসিড, গ্লুকোজ, ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারল রক্তের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এসব স্থানের প্রোটোপ্লাজম নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে আমিষ, স্নেহ ও শর্করা তৈরি হয়। ফলে প্রোটোপ্লাজম কোষের ক্ষয়পূরণ ও গঠনে সহায়তা করে। ফলে দেহের বৃদ্ধি ঘটে।

আন্ত্রিক সমস্যার কারণে কখনও কখনও নিম্নলিখিত রোগ বা শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয় যেমন—

অজীর্ণতা : একে আমরা বদহজমও বলে থাকি। নানা কারণে বদহজম হয় বা হজমে ব্যাঘাত ঘটে। যেমন— পাকস্থলিতে সংক্রমণ, বিষণ্ণতা, অগ্ন্যাশয় রোগ, থাইরয়েডের সমস্যা, এনজাইমের ঘাটতি, ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

পেটের উপরের দিকে ব্যথা, পেট ফাঁপা, পেট ভরা মনে হয়, বুক জ্বালা করা, বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, বুক ব্যথা, টক টেকুর উঠা ইত্যাদি অজীর্ণতার লক্ষণ। পাকস্থলি বা অন্ত্রের আলসারের কারণেও হজমে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

অজীর্ণতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যা করতে হবে তা হলো— অতি ভোজন না করা, আস্তে আস্তে উত্তমরূপে খাবার চিবিয়ে খাওয়া, ধূমপান পরিহার করা। প্রয়োজনে অজীর্ণতার কারণ নির্ণয় করে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করা।

আমাশয় (Dysentery) : *Entamoeba histolytica* নামক এক প্রকার প্রটোজোয়া অথবা সিগেলা নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আমাশয় হয়।

ঘন ঘন মল ত্যাগ, মলের সাথে শ্লেষা বের হওয়া, পেটে ব্যথা, অনেক সময় শ্লেষায়ুক্ত মলের সাথে রক্ত যাওয়া ও দুগ্ধজাত দ্রব্য হজম না হওয়া আমাশয় রোগের লক্ষণ।

এ রোগ প্রতিকারে যা করতে হবে তা হলো— বিশুদ্ধ পানি পান করা, শাকসবজি ও ফলমূল উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধৌত করা, মল ত্যাগের পর হাত সাবান বা ছাই দিয়ে উত্তমরূপে ধৌত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খাওয়ার আগে হাত ও থালাবাসন উত্তমরূপে ধুয়ে নেওয়া। প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। সময়মতো চিকিৎসা না করা হলে মারাত্মক কিছু ঘটতে পারে।

কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation) : এটি কোনো বিশেষ ধরনের রোগ নয়। যখন কারো শক্ত পায়খানা হয় অথবা আর দু বা তারও বেশি দিন পায়খানা হয়না এ অবস্থাকে বলা হয় কোষ্ঠকাঠিন্য। বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে, যথা— পায়খানার বেগ চেপে রাখলে, কোলন অপাচ খাদ্যাংশ থেকে অতিমাত্রায় পানি শোষণ করলে, পৌষ্টি নালির মধ্য দিয়ে খাদ্যের অপাচ অংশ ধীরে ধীরে গমনে মল থেকে বেশি পানি শোষিত হলে, পরিশ্রম না করলে, আন্ত্রিক গোলযোগে, কোলনের মাংসপেশি আস্তে আস্তে সংকুচিত হলে, রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাবার না খেলে কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়।

কোষ্ঠকাঠিন্যের কারণে মল ত্যাগ কষ্টদায়ক হয়। ফলে পেটে অস্বস্তিকর অবস্থা, পেট ব্যথা ও নানা রকম আনুষঙ্গিক অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

এ রোগ প্রতিকারে যা করতে হবে তা হলো— আঁশযুক্ত খাবার খাওয়া, প্রচুর পানি পান করা, নিয়মিত শাকসবজি, আপেল,

নারকেল, খেঁজুর, আম, কমলা, পেঁপে, আনারস, চা, কলা ইত্যাদি খাওয়া। নিয়মিত মল ত্যাগের অভ্যাস করা, হাঁটা চলার অভ্যাস গড়ে তোলা।

গ্যাস্ট্রিক আলসার (Gastric ulcer) : আলসার হলো পাকস্থলির বা অন্ত্রের প্রদাহ বা ক্ষত। দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যগ্রহণে অনিয়ম হলে পাকস্থলিতে অন্ত্রের আধিক্য ঘটে। অনেক দিন ধরে এ অবস্থা চলতে থাকলে পাকস্থলি বা অন্ত্রে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তখন একে গ্যাস্ট্রিক আলসার বলে।

এ রোগে পেটের ঠিক মাঝখানে একঘেয়ে ব্যথা অনুভব হয়। খালি পেটে বা অতিরিক্ত তেলজাতীয় খাদ্য খেলে ব্যথা বাড়ে। আলসার মারাত্মক হলে বমি হতে পারে। কখনও কখনও বমি ও মলের সাথে রক্ত নির্গত হয়। এন্ডোসকপি (Endoscopy) বা বেরিয়াম এক্স-রে এর মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায়।

এ রোগ প্রতিকার করতে হলে যা করতে হবে তা হলো- নিয়মিত সহজপাচ্য খাদ্য গ্রহণ করা, অধিক তেল ও মশলাযুক্ত গুরুপাক খাদ্য পরিহার করা। ফুটানো দুধ, পনির এবং কলা খেলে ভালো উপকার পাওয়া যায়। নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ করে, কফি, সিগারেট ইত্যাদি উত্তেজক পদার্থ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে, প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

অ্যাপেনডিসাইটিস (Appendicitis) : পেটের ডান দিকের নিচে বৃহদন্ত্রের সিকামের সাথে অ্যাপেনডিক্স যুক্ত থাকে। এটি আঙ্গুলের আকারের একটি থলে। অ্যাপেনডিক্সের সংক্রমণের কারণে অ্যাপেনডিসাইটিস হয়। এ রোগে নাভির চারদিকে ব্যথা অনুভব হয় এবং ব্যথা শুরুর হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নিচে ডান দিকে সরে যায়। ক্ষুধামন্দা, বমি, কোষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

এ রোগের প্রতিকারে রোগীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার দেখাতে হবে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি ও প্রয়োজনে শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে অ্যাপেনডিক্সের অপসারণের ব্যবস্থা করতে হবে। অ্যাপেনডিক্সের সংক্রমণ মারাত্মক হলে এটি ফেটে যেতে পারে এবং রোগীর জন্য মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

কৃমিজনিত রোগ

কৃমি পরজীবী হিসেবে পোষক দেহে বাস করে। মানবদেহ অনেক প্রজাতির কৃমির পোষক। বিশেষ করে মানুষের অন্ত্রে গোলকৃমি, সুতাকৃমি ও ফিতাকৃমি পরজীবী হিসেবে বাস করে। কৃমির কারণে পেটে ব্যথা, দুর্বলবোধ করা, বদহজম, পেটে অবস্থিতবোধ, বমি বমি ভাব, অনিদ্রা, খাওয়ায় অরুচি, রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে হওয়া, রক্তাল্পতা দেখা দেওয়া, হাত পা ফুলে যাওয়া, পেট বড় হয়ে ফুলে উঠা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। শিশুর জ্বর হলে অনেক সময় কৃমি মলের সাথে বা নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

রোগীর মল পরীক্ষা করে পেটে কৃমি আছে কিনা তা জনা যায়। মল পরীক্ষায় কৃমির ডিম পাওয়া গেলে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করতে হয়।

কৃমি আক্রান্ত ব্যক্তি দ্বারা অথবা মাছি দ্বারা খাদ্যবস্তু দূষিত হয়। দূষিত খাদ্য কৃমি বিস্তারে সহায়তা করে। কাঁচা ফলমূল ধুয়ে খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা, খাবার আগে হাত উত্তমরূপে ধৌত করা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, খালি পায়ে না হাঁটা এবং অল্প সেন্ধ শাকসবজি বা মাংস না খাওয়া ইত্যাদি সাবধানতা অবলম্বন করে এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ডায়রিয়া (Diarrhoea) : যদি দিনে অন্তত তিনবার পাতলা পায়খানা হয় তবে তার ডায়রিয়া হয়েছে বলে মনে করতে হবে। সাধারণত শিশুরা ডায়রিয়ায় বেশি ভোগে। ডায়রিয়া হলে রোগীর দেহ থেকে পানি ও লবণ বেরিয়ে যায়, দেহের পানি কমে যায়, রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে দেহে পানি ও লবণের স্বল্পতা দেখা দেয়। এসময় যথাযথ চিকিৎসা করা না হলে রোগী মারাও যেতে পারে।

ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়া, বারবার বমি হওয়া, খুব পিপাসা লাগা, মুখ ও জিহবা শুকিয়ে যাওয়া, দেহের চামড়া কুচকে যাওয়া, চোখ বসে যাওয়া ইত্যাদি ডায়রিয়ার উপসর্গ। এসময় রোগী খাবার বা পানীয় ঠিকমতো খেতে চায় না, কঁাদলে শিশুর মাথার চাঁদি বা তালু বসে যায়। আস্তে আস্তে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

দূষিত পানি পান করলে, বাসি-পচা, নোতরা খাবার খেলে, অপরিচ্ছন্ন থালা-বাসন ব্যবহার করলে, অপরিষ্কার হাতে খাবার খেলে এ রোগ বিস্তার লাভের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

ডায়রিয়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করতে হবে। আজকাল বাজারে আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক তৈরি খাবার স্যালাইনের প্যাকেট বাজারে পাওয়া যায়। প্যাকেটের গায়ে স্যালাইন বানানোর নিয়ম লেখা থাকে। ঐ নিয়ম অনুযায়ী স্যালাইন বানাতে হবে। তাছাড়া বাড়িতেও স্যালাইন বানানো যায়। তোমরা ইতোপূর্বে বাড়িতে কীভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায় তা জেনেছ। সম্ভ্রুতি শস্য স্যালাইন নামে আর একটি স্যালাইন উদ্ভাবিত হয়েছে। এক লিটার পানি, ৫০ গ্রাম চালের গুঁড়া, এক চিমটি লবণ মিশিয়ে বাড়িতে এ স্যালাইন তৈরি করা যায়। স্যালাইন ব্যবহারের সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার তা হলো— পাতলা পায়খানা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে, রোগীর বমি হলেও স্যালাইন খাওয়া বন্ধ করা যাবে না, শিশু রোগীকে বুকের দুধ খাওয়ানো, রোগীকে নিয়মিত অন্যান্য খাবারও খাওয়াতে হবে। ডায়রিয়া সেরে যাওয়ার পরও অন্তত এক সপ্তাহ রোগীকে বাড়তি খাবার দিতে হবে।

রোটা ভাইরাসের আক্রমণে ডায়রিয়া হয়। বিশ্বব্যাপী রোটা ভাইরাসজনিত মোট মৃত্যুর ৮২ শতাংশ হয় হত-দরিদ্র দেশগুলোতেই। অনেক কারণে এ রোগে দরিদ্র দেশগুলোতে মৃত্যুর হার বেশি। উন্নত দেশগুলোতেও এ রোগের বিস্তার আছে। তবে মৃত্যুর হার ভুলনামূলকভাবে অনেক কম।

কাঙ্ক্ষ : তোমরা দলবদ্ধ হয়ে শ্রেণিকক্ষে খাবার স্যালাইন তৈরি কর। খাবার স্যালাইন খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা লিখে পোস্টার তৈরি কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ড: রায়হান দিনের অধিকাংশ সময় গবেষণার কাজে গবেষণাগারে সময় কাটান। এতে তার ওজন বেড়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে তার ছোটভাই জহির দেশের জাতীয় যুব ফুটবল দলের একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। সেজন্য তাকে প্রতিদিন অনেক সময় ধরে শারীরিক কসরত ও খেলাধুলা করতে হয়।
 - ক. কোন জাতীয় খাদ্য দেহে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে?
 - খ. উচ্চমানের আমিষ বলতে কী বুঝায় ব্যাখ্যা কর।
 - গ. জহিরের খাদ্য তালিকায় কোন ধরনের খাবার অধিক থাকা দরকার? কারণ ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. জহিরের খাদ্য তালিকায় কোন ধরনের খাবার ড: রায়হানের জন্য প্রয়োজ্য নয়? বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও।
২. ইরফান আলী লক্ষ করলেন তার বাগানের গাছগুলোর মধ্যে ঘাসজাতীয় গাছের পাতা হলুদ হয়ে গেছে এবং ফুল গাছের পাতা, ফুল ও কুঁড়ি ঝরে যাচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে তিনি একজন উদ্যানতত্ত্ববিদের শরণাপন্ন হলেন। তিনি তাকে তার বাগানে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অত্যাৱশ্যকীয় কিছু উপাদান সরবরাহের পরামর্শ দিলেন।
 - ক. মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট কী?
 - খ. উদ্ভিদের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় উপাদান কী? ব্যাখ্যা কর।
 - গ. ইরফান আলীর বাগানের ঘাসজাতীয় উদ্ভিদের সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা কর।
 - ঘ. উদ্ভিদের উদ্যানতত্ত্ববিদের পরামর্শ মূল্যায়ন কর।